ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, চেয়ারপারসন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম. হাফিজউদ্দিন খান, সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

সুমাইয়া খায়ের, উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

তত্ত্বাবধান
মো. ওয়াহিদ আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
দিপু রায়
প্রোগ্রাম ম্যানেজার-রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা সহায়তায়
জসিয়া নিশাত করোবী, স্বল্পমেয়াদী গবেষণা সহকারী

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (পঞ্চম তলা)
বাড়ি নং ৫, রাস্তা নং ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯
ফ্যাক্স: ৯১২৪৭৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এ প্রেক্ষিতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়' (ওসিএজি) এ বিরাজমান সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

সরকারের আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গত কয়েক বছরে সিএজি কার্যালয়ে নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেটেড) পদ্ধতির প্রচলন, মিডিয়া সেল গঠন ও সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ওসিএজির প্রতিবেদন জনসম্মুখে নিয়ে আসার মত উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হলেও প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি, নিরীক্ষা আইনের অনুপস্থিতি, মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীলতা, সুযোগ-সুবিধার ঘাটতির পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একাংশ বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যাশিত পর্যায়ের দক্ষতা ও কার্যকরতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না বলে গবেষণায় দেখা যায়। ফলে সরকারি অর্থ অপচয় হচ্ছে, নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ব্যয় ও আত্মসাৎ নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি হচ্ছে এবং সার্বিকভাবে রাষ্ট্রীয় খাতে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

গবেষণাটি সম্পন্ন করতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক শ্রদ্ধেয় মাসুদ আহমেদ আন্তরিকতার সাথে সহায়তা করেছেন, সেজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁর সভাপতিত্বে গবেষণার খসড়া প্রতিবেদনটি ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ এ সিএজি কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মূল্যবান মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি সমৃদ্ধতর হয়েছে ও সিএজি কার্যালয়ের এ ধরনের সহযোগিতার জন্য তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গবেষণা দলকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় তাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক দিপু রায়। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাকে সহায়তা করেছেন স্বল্প মেয়াদী গবেষণা সহকারী জসিয়া নিশাত। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, প্রাক্তন চেয়ারপার্সন এম হাফিজউদ্দিন খান ও অন্যান্য ট্রাস্টিগণ এই গবেষণা সম্পন্ন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রাক্তন চেয়ারপার্সন এম হাফিজউদ্দিন খান গবেষণা প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সিএজি কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটির সমস্যা দূর করে এটিকে আরও স্বচ্ছ, কার্যকর ও জবাবদিহিতামূলক করে তুলতে পারলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওসিএজিকে এগিয়ে নিতে সরকারসহ সকল অংশীজনের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে টিআইবি আগ্রহী।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	iii
শব্দ সংক্ষেপ	vi
সার-সংক্ষেপ	viii
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	**০৯**
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	
১.৩ গবেষণার পরিধি	
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	
১.৪.১ তথ্যের উৎস	
১.৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই	
১.৫ গবেষণা কাল	
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	
দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো	**১৩**
২.১ সিএজি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গঠন	১৩
২.২ সিএজি কার্যালয়ের আইনগত কাঠামো	১৩
২.৩ সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম	১৮
২.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	২০
২.৫ প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম	২২
২.৬ সিএজি কার্যালয়ের সংস্কারমূলক কার্যক্রম	২২
২.৭ সিএজি কার্যালয়ের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ	২৩
২.৮ কল্যাণ সমিতি	২৩
২.৯ ওয়েবসাইট	২৩
তৃতীয় অধ্যায়: আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা	**২৪**
৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা	**২৪**
৩.২ সিএজির কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ	**২৬**
৩.২.১ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা	**২৬**
৩.২.১.১ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রমাসন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা	২৬
৩.২.১.২ জনবল সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা	২৮
৩.২.৩ প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা	৩২
৩.২.৪ জবাবদিহিতায় সমস্যা	৩৩
৩.২.৫ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা	৩৩
৩.২.৬ তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা	৩৫
৩.২.৭ সংস্কারমূলক কার্যক্রমে সমস্যা	৩৫
৩.৩ ওসিএজির কার্যক্রম ফলপ্রসু না হওয়ার (নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায়ে) বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ	৩৬
চতুর্থ অধ্যায়: সিএজি কার্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি	**৩৯**

৪.১ নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতি ৩৯
৪.২ পদায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি ৪০
৪.৩ প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে অনিয়ম ৪০
৪.৪ দায়িত্বে অবহেলা ৪১
৪.৫ মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকালীন অনিয়ম-দুর্নীতি ৪৩
৪.৬ মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষার পরবর্তী সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি ৪৫
৪.৭ অাডিট অধিদপ্তর অনুযায়ী দুর্নীতির চিত্র ৪৬
৪.৭.১ সিভিল অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.২ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৩ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৪ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৫ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৬ প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৭ ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৮ পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি
৪.৭.৯ সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক চিত্র
পঞ্চম অধ্যায়: পূর্বের গবেষণার সাথে তুলনামূলক চিত্র ৫০
ষষ্ঠ অধ্যায়: বিভিন্ন দেশের সরকারি নিরীক্ষা কার্যালয়ের তুলনামূলক চিত্র ৫৩
৬.১ একটি আদর্শ নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ৫৩
৬.২ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও বৈশিষ্ট্য ৫৪
৬.৩ বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের তুলনামূলক চিত্র ৫৭

সপ্তম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ ৫৯

সারণি তারিকা

সারণি ১.১: বছর অনুযায়ী ওসিএজি কর্তৃক সমন্বয় ও উদ্ধারকৃত অর্থ ০৯
সারণি ২.১: সিএজি কার্যালয়, অধিদপ্তর এবং ফিমার অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের পদের শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণ ২১
সারিণ ৩.১: অর্থ বছর অনুযায়ী টিএ-ডিএ বাবদ চাহিদাকৃত বাজেট ও প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ২৭
সারণি ৩.২: আলোচিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংখ্যা ৩৭
সারণি ৪.১: সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র ৪৮
সারণি ৫.১: ২০০২ সালের গবেষণা প্রতিবেদনের সাথে বর্তমান গবেষণার তুলনা ৫০
সারণি ৬.১: বিশ্বে বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র ৫৭
সারিণি ৭.১: সিএজি কার্যালয়ের সমস্যার ধরন, ফলাফল ও প্রভাবের সার্বিক চিত্র ৫৯

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: নিরীক্ষা কার্যক্রমের ধাপসমূহ ২০
চিত্র ৩.১: সিএজি কার্যালয়, অধিদপ্তর এবং ফিমার জনবলের কর্মরত ও শূণ্য পদের হার ২৮

বক্সের তালিকা

বক্স ১: হালনাগাদকৃত নিয়ম না জানানোর কারণে আপত্তি উত্থাপণ ২৬
বক্স ২: ঘুষ নিয়ে ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা না করা ৪২
বক্স ৩: গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন ৪৩
বক্স ৪: একই আপত্তি বার বার উত্থাপন ৪৪
বক্স ৫: ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে হয়রানি ৪৫

বক্স ৬: সরকারের ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঘুষ প্রদান ৪৭

পরিশিষ্ট তালিকা

পরিশিষ্ট ১: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ৬২
পরিশিষ্ট ২: অডিট অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং লোকবল ৬৩
পরিশিষ্ট ৩: অধিদপ্তর, সিএজি কার্যালয় ও ফিমা অনুযায়ী ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা ৬৪
তথসূত্র **৬৫**

Acronyms

ADCAG- Additional Deputy Comptroller and Auditor General
AMS- Audit Monitoring System
ANAO- Australian National Audit Office
ASOSAI- Asian Organization of Supreme Audit Institutions
ATNs- Action Taken Notes
BCS- Bangladesh Civil Service
BRTA- Bangladesh Road Transport Authority
BRTC- Bangladesh Road Transport Corporation
BWDB- Bangladesh Water Development Board
CAAT- Computer Assisted Audit Technique
CMS- Central Management System
CPU- Committee on Public Undertakings
CQAC- Central Quality Assurance Committee
DA- Divisional Accountant
DCAG (A&R) - Deputy Comptroller and Auditor General (Accounts and Report)
DST- Direct Substantive Testing
DTCB- Dhaka Transport Coordination Board
ED- Efficiency Divided
EWA- Entity Wide Audit
FAPAD- Foreign Aided Projects Audit Directorate
GoB- Government of Bangladesh
ICAB- Institute of Chartered Accountants of Bangladesh
ICS- Internal Control System
IGS- Institute of Governance Studies
IMED- Implementation Monitoring and Evaluation Division
INTOSAI- International Organization of Supreme Audit Institutions
IT- Information Technology
LAR- Local Audit Report
LGED- Local Government Engineering Department
L&R- Local & Revenue
HR- Human Resources
MoE- Ministry of Establishment
MoF- Ministry of Finance
MoU- Memorandum of Understanding
MTBF- Medium- Term Budgetary Framework
NAO- National Audit Office
OCAG- Office of the Comptroller and Auditor General
PAC- Public Accounts Committee
PD- Project Director
PMO- Prime Minister’s Office
PPP- Public- Private Partnership

PT &T- Post, Telegraph, and Telephone
QAC- Quality Assurance Committee
RIGA- Reform in Government Audit
RoB- Rules of Business
SAI- Supreme Audit Institution
SAS- Subordinate Accounts Service
SBA- System- based Approach
SCOPE- Strengthening Comptrollership and Oversight of Public Expenditure
SFI- Serious Financial Irregularities
STOCAG- Strengthening the Office of the Comptroller and Auditor General
TASK- Training in Budgeting and Accounting System
TIB- Transparency International Bangladesh
TIBAS- Training in Budgeting and Accounting System
UK- United Kingdom
UN- United Nations
VFM- Value for Money

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সুশাসন অপরিহার্য। সুশাসনের প্রধান উপাদান হচ্ছে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, অংশগ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং আইনী ও রাজনৈতিক কাঠামো সুসংহতকরণ।[১] ব্যর্থ সুশাসনের ফলাফল হচ্ছে দুর্নীতি। অন্যদিকে দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য সুশাসনকে শক্তিশালীকরণ ও সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনায়[২] স্বচ্ছতা আনা জরুরী। সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবস্থাপনার মূলই হচ্ছে সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা। সরকারি অর্থের উন্নত ব্যবস্থাপনা হচ্ছে সুশাসনের মূল লক্ষ্য এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (৮) অর্জনের চাবিকাঠি।[৩] আর সরকারি খাতের নিরীক্ষা হচ্ছে সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা সরকারি অর্থ দক্ষ ও কার্যকরভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই নিরীক্ষা অপব্যয়, অতিরিক্ত ব্যয়, অসৎ কার্যক্রম এবং সরকারি অর্থের অপচয় রোধের মত অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের অবৈধ কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ না করা হলে অপব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং দুর্নীতি চরম আকার ধারণ করে।[৪] ফলে সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়, বিদেশী বিনিয়োগকারীরা এদেশে বিনিয়োগ করার প্রতি আগ্রহ হাড়ায় যার প্রভাব পরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে।

বাংলাদেশে সরকারের প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাকরণ ও আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে যে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় যে স্তম্ভগুলো কাজ করছে তার মধ্যে 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়' (ওসিএজি) অন্যতম। সংবিধানের ১২৮ এর (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব নিরীক্ষা করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে প্রতিবেদন দান করিবেন'। সিএজি কার্যালয় হচ্ছে বাংলাদেশের সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউট। এই কার্যালয় সরকারি অর্থের তত্ত্বাবধান ও সরকারের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, যারা বাহ্যিক নিরীক্ষক হিসেবে সরকারি ও সায়ত্তশাসিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক জবাবদিহিতা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে। এ কার্যালয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা, কার্যকরতা ও মিতব্যয়ীতা আনার ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বারোপ করে থাকে। সিএজি কার্যালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে সরকারি অর্থ কত দক্ষতার সাথে ব্যয় হচ্ছে এবং এই ব্যয়ের ফলে আয়কর প্রদানকারী ও দরিদ্র মানুষের উপকারে কি কি অর্জিত হচ্ছে তার বস্তুনিষ্ঠ, সময়োপযোগী সংশ্লিষ্ট তথ্যের পর্যালোচনা উপস্থাপন করা। এই বিভাগের মাধ্যমে সংসদের প্রতি নির্বাহী বিভাগের এবং কর প্রদানকারীদের প্রতি সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। ওসিএজির ত্রুটিহীন, ভারসাম্যপূর্ণ, সৎ, পক্ষপাতহীন ও বস্তুনিষ্ঠ কার্যক্রমের উপরেই সরকারের জবাবদিহিতা নির্ভর করে।

সিএজি কার্যালয় সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং ৫০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশের উর্ধ্বে সরকারি মালিকানায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পাদন করে। নিরীক্ষার মাধ্যমেই সিএজি কার্যালয় প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম বা দুর্নীতি চিহ্নিত করে। সরকারি সম্পদ কোন কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে, কিভাবে ব্যয় হচ্ছে, সরকারী নিয়মানুসারে ব্যয় হচ্ছে কিনা- এই বিষয়গুলো যাচাই করার জন্য মূলত নিরীক্ষা করা হয়। এই নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কার্যালয়ের অর্থ ব্যয়ের উপরে যে ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায় তার উপরে আপত্তি উত্থাপন করে অবৈধ ব্যয়কারী সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে তা আদায় করার চেষ্টা করা হয়। আর নিরীক্ষা

---

[১] http://www.oecd.org/development/effectiveness/41085468.pdf

[২] সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা বলতে সরকারের বাজেট প্রক্রিয়াা সকল উপাদানকে বোঝানো হচ্ছে যেখানে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, হিসাব, আর্থিক পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন, নীরিক্ষা ও তদারকি

[৩] The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf, 13.01.14

[৪] হাকিম আহমেদ আতাউল, পাবলিক ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট: দি রোল অফ সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউট(এসএআই) অফ বাংলাদেশ- ইস্যুস এন্ড চ্যালেঞ্জেস, ২০১৩

কার্যক্রম শেষে আপত্তিগুলো প্রতিবেদন আকারে উল্লেখ করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদন কোনো প্রতিষ্ঠানের অবৈধ কার্যক্রমের রেকর্ড উপস্থাপন করা হয় যার মাধ্যমে এই অবৈধ কার্যক্রম থেকে উত্তরণের পথও সৃষ্টি করা হয়। এভাবে ওসিএজি নিরীক্ষা কার্যক্রমের পরে তা রেকর্ড আকারে রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে সরকারি অর্থ অপচয় ও আত্মসাৎ রোধে কাজ করে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মোট ১৮৫২৭.৮৫ কোটি টাকা সমন্বয় ও উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ২০১০-১১ সালে নবম জাতীয় সংসদে ১৩১৮টি নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়। এখানে ১৬টি খাতে আপত্তিকৃত মোট অর্থের পরিমান ছিল ২৩৯১ মিলিয়ন যার মধ্যে উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমান ছিল ১৫৮৩.৭ মিলিয়ন টাকা।[৫] আবার ২০১১-১২ সালে ওসিএজি কর্তৃক মোট ৩০,৩৭৯টি আপত্তি নিস্পত্তি করা হয় এবং এসব আপত্তির সাথে মোট ৮৯২৪.৮ কোটি টাকার সংশ্লিষ্টতা ছিল।[৬]

সারণি ১.১: বছর অনুযায়ী ওসিএজি কর্তৃক সমন্বয় ও উদ্ধারকৃত অর্থ

বছর	**সমন্বয় ও উদ্ধারকৃত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন)**
২০০৯	৫৭১৪৯.৫
২০১০	১০০৪.৬
২০১১	২৩৯১.০
২০১২	৮৯২৪৮.১
২০১৩	১৩৯৬৭.৪
মোট	**১৮৫২৭৮.৫**

তথ্যের উৎস: ওসিএজির বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, ২০১০, ২০১১, ২০১২ ও ২০১৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সিএজি কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং উত্তরোত্তর উন্নতির দিক বিবেচনা করে টিআইবি ২০০২ সালে এই কার্যালয়ের উপরে একটি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছিল। উক্ত গবেষণায় আইনগত সীমাবদ্ধতা যেমন নিরীক্ষা ও হিসাবকে আলাদা করার আইন বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রদানের ক্ষেত্রে রুলস অফ বিজনেস ১৯৯৬ এর মাধ্যমে সংবিধান লঙ্ঘন, বাজেট এবং লোকবল নিয়োগে ওসিএজিকে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাপণ মন্ত্রণালয় (বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়) এর ওপরে নির্ভরশীল হওয়া এবং সংবিধানে সিএজির কার্যকালের মেয়াদ ৬০ বছর হওয়ায় সিএজি হিসেবে কার্যক্রম পালনে যথেষ্ট সময় না পাওয়া ইত্যাদি বিষয় উঠে আসে। এ কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার মধ্যে ছিল দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অভাব, ক্যাডার কর্মকর্তাদের স্বল্পতা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা কাজে না লাগানো, প্রণীত নিরীক্ষা প্রতিবেদন জন সাধারণকে না জানানোর তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে সিএজি কার্যালয়ের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পরা এবং অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিরীক্ষা আপত্তি আকারে প্রাধান্য দেওয়ার মতো দুর্নীতির তথ্য উঠে আসে। আবার সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা না করা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর নিরীক্ষা আপত্তির উত্তর দিতে দেরি করার তথ্যও এই গবেষণায় উঠে আসে।

২০০২ সালের গবেষণার পরে সিএজি কার্যালয়ে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অটোমেশনের সংযোজনের মাধ্যমে নিরীক্ষাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ, মিডিয়া এবং কমিউনিকেশন সেল গঠনের মাধ্যমে তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ওসিএজির প্রতিবেদন জনগণকে জানানোর উদ্যোগ, খসড়া নিরীক্ষা আইন প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় যেমন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, পাইলট নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের হালনাগাদ অডিটিং কনসেপ্ট যেমন CIPFA কোর্সের মাধ্যমে

[৫] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
[৬] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২, বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

প্রশিক্ষণ প্রদান, স্টাফদের সততার সাথে কাজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনারের আয়োজন ও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সিএজির কার্যকালের ক্ষেত্রে তার বয়স ৬০ বছরের পরিবর্তে ৬৫ বছর করা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর প্রথম বারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওসিএজি প্রতিবেদন জনসম্মুক্ষে নিয়ে আসা হয়।[৭]

উপরোক্ত পরিবর্তন সাধিত হলেও এখনও এই কার্যালয়ের কিছু সমস্যা বিরাজমান রয়েছে। এসব সমস্যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতা। এসব সীমাবদ্ধতার ফলে সিএজি কার্যালয় অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। অন্যদিকে এই কার্যালয়ের কর্মকর্ত-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে রয়েছে সরকারি কার্যালয়ের[৮] নানারকম দুর্নীতির অভিযোগ। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় সম্পর্কেই দুর্নীতির বিভিন্ন রকম তথ্য পত্রিকা বা মিডিয়াতে আসলেও সিএজি কার্যালয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে মিডিয়াতে খুব বেশি তথ্য প্রকাশ হতে দেখা যায় না। এ দুর্নীতির কারণে নিরীক্ষা টিম কর্তৃক সঠিকভাবে আপত্তি উত্থাপন না করা ও আত্মসাৎকৃত অর্থের আদায় না হওয়ায় আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে না। বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ে কী ধরনের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম-দুর্নীতি অব্যহত রয়েছে তা দেখার জন্যই টিআইবি সিএজি কার্যালয়ের উপরে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য
এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সিএজি কার্যালয়ের সুশাসনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা।

বিশেষ উদ্দেশ্য
১. সিএজি কার্যালয়ে কি ধরনের আইনগত, কাঠামোগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে তা চিহ্নিত করা
২. বর্তমানে সিএজি কার্যালয়ে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রা চিহ্নিত করা
৩. সিএজি কার্যালয়ে বিরাজমান সমস্যা ও দুর্নীতি থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা

১.৩ গবেষণা পরিধি
এই গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের আইনগত কাঠামো, কার্যক্রম, সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, সুযোগ-সুবিধা, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক, সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি, সংসদ ও মন্ত্রণালয়ের ভুমিকা ইত্যাদি বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োগকৃত কার্যকর ও দৃষ্টান্তমূলক বিষয়গুলোও এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের নিরীক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে বাংলাদেশের নিরীক্ষাকে আরো দক্ষ ও কার্যকর করা যায়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি
এটি একটি গুণবাচক গবেষণা। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এই গবেষণায় মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা (জিডি), পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান নথি পর্যালোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪.১ তথ্যের উৎস
পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি বিভিন্ন প্রকাশনা, সংবিধান, ওসিএজি ও ওসিজিএ প্রকাশনা, ম্যানুয়াল, সরকারের বিভিন্ন আদেশ ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ও প্রবন্ধ।

---
[৭] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১, ২০১২, বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ও ওয়েবসাইট - http://www.cagbd.org
[৮] বিটিসিএল, সমবায় অধিদপ্তর, এলজিইডির স্থানীয় সরকার খাতের উপরে প্রণীত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের গবেষণা প্রতিবেদন

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিশেষজ্ঞ। তথ্য সংগ্রহের কৌশল ছিল মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, দলীয় আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ। এই গবেষণায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, বিভাগ, বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪০টি সরকারি কার্যালয়ের ৬৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিএজি ও সিজিএ কার্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান ২৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিশেষজ্ঞ ২ জনসহ মোট ৯৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে তাদের পরিচয় গোপন রাখার শর্তে চেক লিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও যাচাই

এই গবেষণায় গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ তথ্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে কমপক্ষে তিনটি উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এর সত্যতা যাচাই করে প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণা কাল

মার্চ ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করা হয়।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদন মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কর্ম পরিধির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে সিএজি কার্যালয়ের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে সিএজি কার্যালয়ের অনিয়ম, দুর্নীতির ধরন, দুর্নীতির ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ২০০২ সালের গবেষণার সাথে বর্তমান গবেষণার তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপণ করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষা পদ্ধতি, নিরীক্ষা কার্যালয়ের কাঠামো ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক ও কার্যকর বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সপ্তম অধ্যায়ে সিএজি কার্যালয়ে বিরাজমান সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রতিষ্ঠান পরিচিতি ও আইনগত কাঠামো

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও সরকারি অর্থ ব্যয়কারী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যার নাম সিএজি কার্যালয়। এই কার্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে প্রথমেই এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্ম পরিধি, জনবল, বাজেটসহ বিষয়ে জানা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সিএজি কার্যালয়ের আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জনবল, কার্যক্রম, সংস্কারমূলক কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো।

২.১ সিএজি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গঠন

১৮৬০ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে সমন্বিত হিসাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিএন্ডএজি দায়িত্ব পালন করে আসছে। তখন সিএন্ডএজি পদটি তৈরি করা হয়েছিল বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ভাসরয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। সময়ের ব্যবধানে সার্বিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তনে বর্তমানে সিএজি কার্যালয় বাংলাদেশের জনগণের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে, মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএজি)- এর কার্যালয় ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধানের ১২৭ থেকে ১৩২ অনুচ্ছেদে দেশের সর্বোচ্চ নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ হিসেবে সিএজির আইনগত ও কাঠামো সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। সিএজি হচ্ছেন এই কার্যালয়ের প্রধান যিনি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে নিয়োগ হবেন।[৯] সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের হিসাব ও নিরীক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে সিএজির। কিন্তু ১৯৮৩ সালের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশনস) (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স অনুসারে সরকারের হিসাব রাখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার বিধান করা হয়। বাস্তবে সেই দাায়িত্ব পালনের জন্য সিএজি ৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্রের হিসাব তৈরি করে। ১ জুলাই ২০০২- এ সরকার সরকারি হিসাব ব্যবস্থা, নিরীক্ষা বিভাগ থেকে আলাদা করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের নিকট হস্তান্তর করেছে।

২.২ সিএজি কার্যালয়ের আইনগত কাঠামো

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত আইন, ম্যানুয়াল, গাইডলাইন ও স্টান্ডার্ট অনুসরণ করা হয়।

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
- দি কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) ১৯৭৪
- গভমেন্ট অডিটিং স্টান্টার্ড
- অডিট কোড
- ট্রেজারি রুলস এবং সাবসিডিয়ারি/ভর্তুকি রুলস
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস সংকলন
- নৈতিক আচরণ বিধি (কোড অব এথিকস)
- নিরীক্ষা ম্যানুয়াল- সিভিল, স্থানীয়, রাজস্ব এবং পারফর্মেন্স নিরীক্ষা
- বিদেশে মিশনের জন্য ফিন্যান্সিয়াল অডিট গাইডলাইন
- মিশন অডিটের জন্য রুলস, সার্কুলার এবং সরকারি আদেশের সংকলন
- তথ্য প্রযুক্তি নীতি
- মিডিয়া হ্যান্ডবুক
- যোগাযোগ কৌশল

[৯] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১২৭ অনুচ্ছেদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান[১০]
সংবিধানের ১২৭ থেকে ১৩২ অনুচ্ছেদ সিএজি কার্যালয়েরর বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানে যেসব বিষয় উল্লেখ রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

অনুচ্ছেদ ১২৭- সিএজি কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠা
অনুচ্ছেদ ১২৮ - সিএজি কার্যালয়ের কর্মপরিধি
অনুচ্ছেদ ১২৯ - সিএজির মেয়াদ কাল
অনুচ্ছেদ ১৩০ - ভারপ্রাপ্ত সিএজির নিয়োগ
অনুচ্ছেদ ১৩১ - সরকারি হিসাব রক্ষণের ধরন ও পদ্ধতি
অনুচ্ছেদ ১৩২ - অডিটর জেনারেলের প্রতিবেদন সংসদের নিকট পেশ

অডিট কোড
বিভিন্ন ধরনের নিরীক্ষা যেমন হিসাবের নিরীক্ষা, নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা, পারফরমেন্স নিরীক্ষা কিভাবে করা হবে তা অডিট কোডে বিস্তারিত বর্ণনা করা অছে।[১১] নিরীক্ষা কালে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে থাকে।

১. ক্রয় মঞ্জুরিকৃত এবং অনুমোদিত কিনা
২. চালান (invoice) গুণগত মান, পরিমাণ, মূল্য ইত্যাদির নিরিখে পরীক্ষিত হয়েছে কি না এবং তা সঠিকভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত ও যথাযথভাবে ক্যাশ বইয়ে লেখা হয়েছে কি না
৩. অনিয়ম কিংবা অসামঞ্জস্যতার কোন ইঙ্গিত আছে কি না
৪. নিম্নমানের ভ্যালু-ফর-মানি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদির কোন ইঙ্গিত আছে কি না ও
৫. হিসাবরক্ষণ কার্যালয় সকল দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করেছে কিনা ইত্যাদি

গভর্নমেন্ট অডিটিং স্টান্টার্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক ওসিএজিকে প্রদেয় দায়িত্ব সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে পালন করার কথা বলা হয়েছে। এই প্রত্যাশাকে সামনে রেখে নিরীক্ষার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখা ও তার সর্বোত্তম চর্চা করা এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার জন্য গভমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড তৈরি করা হয়। এই গভমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ডটি সংবিধান, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়াল এবং সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন (INTOSAI) এর সদস্য দেশের সুপারিশের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষক এবং স্টাফদের কাজের দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করলেও এই অডিটিং স্টান্ডার্ড সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেরও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষায় সহায়ক হিসেবে কাজ করে। এই স্টান্ডার্ডে সিএজি কার্যালয়ের স্টাফ এবং তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমের স্বাধীনতা এবং পেশাদারীত্বের সামর্থ, নিরীক্ষা কাজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সতর্কতার চর্চা, সঠিক পরিকল্পনা এবং সুপারভিশন, মানদন্ডের ন্যায্যতা, সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর্যাপ্ত, বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য প্রমান এবং নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপরে জোর দেয়।[১২]

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) ১৯৭৪

---

[১০] বিস্তারিত জানতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান দেখুন
[১১] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ওয়েবসাইট - http://www.cagbd.org এ অডিট কোড দেখুন
[১২] বিস্তারিত জানতে বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের ওয়েবসাইট - http://www.cagbd.org এ গভর্নমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড দেখুন

যেহেতু বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদের (৩) উপ-অনুচ্ছেদে এই বিধান রাখা হয়েছে যে, সংসদ আইন দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদের (১) উপ-অনুচ্ছেদে[১৩] বর্ণিত কার্যাবলীর অতিরিক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের দায়িত্ব ওসিএজির ওপর অর্পণ করতে পারেন সেহেতু এই দি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল অ্যাডিশনাল ফাংশন্স, ১৯৭৪ প্রণীত হয়। এই আইন অনুসারে ওসিএজিকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

- সরকারের হিসাব রক্ষণ
- আর্থিক ও উপযোজন হিসাব প্রস্তুতকরণ
- সংবিধিবদ্ধ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পন্ন করা
- বাণিজ্যিক হিসাব প্রস্তুতকরণ এবং সাধারণ আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি

১৯৭৫ সালে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) ১৯৭৪ এক সংশোধণী আনা হয়। উক্ত সংশোধণীতে বলা হয় যেসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কমপক্ষে ৫০% সরকারের সেসব প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষাও সিএজি কার্যালয়কে সম্পন্ন করতে হবে।

পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে ১৯৭৪ সালের ২৪ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয় যার নাম দেওয়া হয় **দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) ১৯৭৪ (সংশোধনকৃত ১৯৭৪ সালের ২৪ অনুচ্ছেদ) অ্যাক্ট, ১৯৮৩**। এই আইনে সিএজি কার্যালয়কে সরকারি হিসাব রক্ষণ, উপযোজন ও আর্থিক হিসাব প্রস্তুতকরণ, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ ইত্যাদির হিসাব নিরীক্ষা, বাণিজ্যিক হিসাব প্রণয়ন, সার্বিক বিবরণী প্রণয়ন, নির্দিষ্ট দফতর ইত্যাদি পরিদর্শন, সিএজি কার্যালয় সরকারকে কি ধরনের তথ্য প্রদান করবেন, এবং বিধমিালা প্রণয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

ট্রেজারি রুলস ও সাব সিডিয়ারি রুলস[১৪]

সরকারি অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, সংযুক্ত তহবিলে কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে অর্থ প্রদান বা তা থেকে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা অন্যান্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়মাবলী ট্রেজারী রুলস্ ও সাবসিডিয়ারী রুলস্ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ট্রেজারি রুলসে সরকারের অর্থ কোথায় গচ্ছিত থাকবে, কীভাবে সরকারের রাজস্ব সরকারের হিসাবে জমা করা হবে, কিভাবে তা হেফাজত করা হবে, কিভাবে সরকারের হিসাব থেকে অর্থ উত্তোলন ও স্থানান্তর করা করা হবে এবং তার জন্য কার উপরে দায়-দায়িত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। এই রুলসে বিভিন্ন ধরনের ফরম ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের অর্থ রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। ট্রেজারি রুলসে বলা হয়েছে যে, সরকারি অর্থ অবশ্যই একটি ব্যাংকে গচ্ছিত থাকবে। ব্যংকে গচ্ছিত অর্থ সরকারের পক্ষে ব্যাংকের হিসাবে রক্ষিত একটি সাধারণ তহবিল হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকারি অর্থ ব্যাংকে আমানত রাখার বিষয়টি সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

সাবসিডিয়ারি রুলস হচ্ছে *ট্রেজারি রুলসের* হালনাগাদ সংস্করণ। যেহেতু ১৯৪৪ সালে এই রুলগুলো তৈরি হয়েছে স্বাধীনতার পরে এগুলো হালনাগাদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ১৯৯৮ সালে অর্থ বিভাগের *'রিফর্মস ইন বাজেটিং এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল'* প্রকল্পের মাধ্যমে সংশোধিত *ট্রেজারী রুলস ও সাবসিডিয়ারি রুলস* তৈরি করা হয়।

জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস সংকলন[১৫]

এই বিধিসমূহ বস্তুত রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশাবলী। এতে প্রধানত সরকারের অধস্তন বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের আর্থিক ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত কার্যপ্রণালী বর্ণিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অর্পিত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ

---

[১৩] 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক প্রজতন্ত্রের সরকারী হিসাব এবং সকল আদালত, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারী হিসাব করিবেন ও অনুরূপ হিসাব সম্পর্কে প্রতিবেদনদান করিবেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি কিংবা সেই প্রয়োজনে তাঁহার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি প্রজতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তির দখলভুক্ত সকল নথি, বহি, রসিদ, দলিল, নগদ অর্থ ষ্ট্যাম্প, জামিন ভাণ্ডার বা অন্য প্রকার সরকারী সম্পত্তি পরীক্ষার অধিকারী হইবের'

[১৪] বিস্তারিত জানতে চক্রবর্তী রণজিৎ কুমার, ট্রেজারি রুলস এবং উহার অধীনে প্রণীত সাবসিডিয়ারী রুলস্ (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯, দেখুন

[১৫] বিস্তারিত জানতে চক্রবর্তী রণজিৎ কুমার, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯, দেখুন

ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে এই বিধি অনুসরণ করা হয়। বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ তাদের বিভাগীয় প্রবিধান এবং তাদের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য বিশেষ আদেশে উল্লিখিত বিধি ও নির্দেশাবলী দ্বারা সংযোজিত ও সংশোধিত বিধিমালা অনুসরণ করবে। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে যেহেতু কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক সরকারের বিষয়গুলো আর বহাল থাকেনি তখন জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলসের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ১৯৯৮ সালে অর্থ বিভাগের *'রিফর্মস ইন বাজেটিং এন্ড এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল'* প্রকল্পের মাধ্যমে জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এবং বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রুলস দুটিকে সংশোধন করা হয়। এই সংকলনে স্বাধীনতার পর থেকে সময় সময় সরকার যেসব আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত আদেশ, স্মারক, পরিপত্র জরি করা হয় তার প্রধান বিধানগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে এই সংশোধিত সংকলনটিই কার্যকর রয়েছে। এই সংকলনে বিধৃত বিধিসমূহ একাউন্ট কোড এবং ট্রেজারি রুলসের অতিরিক্ত। স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত কোড এবং রুলস চালু থাকবে।

ন্যায়-নীতি বিধিমালা[১৬]

বাংলাদেশের সিএজি কার্যালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আচরণবিধি রয়েছে। এটি সিএজি কার্যালয়ের ন্যায়-নীতি বিধিমালা হিসেবে পরিচিত। এই বিধিমালা নিরীক্ষকদের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও নীতি সমূহের একটি বোধগম্য বর্ণনা। এই বিধিমালা নিজ নিজ ব্যক্তিগত আচরণ ও ব্যবহারের জন্য দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এই ন্যায়-নীতি বিধিমালা ওসিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বোচ্চ নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (সংসদ, প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ, সাধারণ জনগণ ও নিরীক্ষা আওতাধীন সংস্থা সমূহ, আন্তর্জাতিক সংস্থা) আস্থা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও শ্রদ্ধা অর্জনের পথ নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এই আচরণ বিধিতে নিরীক্ষকদের ন্যায়পরায়নতা, স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা, উপযুক্ততা, সুস্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, সঠিকতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সুনির্দিষ্টতা, সম্পূর্ণতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই কার্যালয়ের আরও কিছু ন্যায়-নীতি বিধান রয়েছে যা কর্মকর্তা- কর্মচারীদের অবশ্য পালনীয়।

অডিট ম্যানুয়াল

সিভিল অডিট ম্যানুয়াল

সরকারি হিসাব ব্যবস্থা বিভাগীয়করণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ওসিএজির নিরীক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সনে সিভিল অডিট অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অধিদপ্তরের আওতা, উদ্দেশ্য, জনবল, সাংগঠনিক কাঠামো, দায়িত্ব-কর্তব্য, অন্যান্য সংগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং তাদের নিরীক্ষার ফলাফল কিভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে সে বিষয়ে এই ম্যানুয়ালে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এই অধিদপ্তর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ধরনের নিরীক্ষা করা হবে কিভাবে করা হবে তার পরিকল্পনা পর্যায়ে কি কি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিরক্ষা, রেলওয়ে, সড়ক ও জনপথ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও গণপূর্ত বিভাগ ব্যতীত সরকারের ব্যয় ও প্রাপ্তি সংক্রান্ত লেনদেন পরীক্ষার জন্য সিজিএ কার্যালয়ের অধীনস্থ সকল কার্যালয় যেমন- প্রধান হিসাবরক্ষণ, বিভাগীয়, জেলা উপজেলা পর্যায়ের সকল হিসাব রক্ষণ কার্যালয় এই অধিদপ্তর দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়।[১৭]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট ম্যানুয়াল[১৮]

স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করার জন্য এই ম্যানুয়াল তৈরি করা হয়। এই অধিদপ্তর কোন কোন কার্যালয় নিরীক্ষা করবে, কিভাবে পরিকল্পনা করবে, কোন নীতিমালা অনুসরণ করবে তা এই ম্যানুয়ালে উল্লেখ রয়েছে। যেমন এই অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কার্যালয়ের নিরীক্ষা করে থাকে। প্রায় ১২০০০ স্বতন্ত্র কার্যালয় বা ইউনিট স্থানীয় নিরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

---

[১৬] বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org এ কোড অফ কন্ডাক্ট দেখুন

[১৭] বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org এ সিভিল অডিট ম্যানুয়াল দেখুন

[১৮] বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org এ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট ম্যানুয়াল দেখুন

সরকারি রাজস্ব, বিশেষ কর যেমন- আয়কর, শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর ইত্যাদি কার্যালয় বা ইউনিটের নিরীক্ষা কিভাবে করা হবে তার জন্য কি কি পরিকল্পনা নিতে হবে ইত্যাদি বিষয় রাজস্ব অডিট ম্যানুয়ালে বর্ণনা করা হয়েছে। এই নিরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ক) রাজস্ব নির্ধারণ, আদায় এবং হিসাবভুক্তির ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যাপ্ত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা যাচাই করা; খ) বিধি-বিধান ও পদ্ধতিসমূহ পালন করা হয় কিনা দেখা; গ) সময়মত এবং নিষ্ঠার সাথে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান রাজস্ব নির্ধারণ, আদায় এবং হিসাবভুক্ত করেছে কিনা যাচাই করা; এবং ঘ) রাজস্ব ক্ষতি নিবারণ করার উদ্দেশ্যে, প্রতারণা, দুর্নীতি, অবহেলা, নিরোধ চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকর কিনা পরীক্ষা করা।

পারফর্মেন্স অডিট ম্যানুয়াল

সিএজি কার্যালয়ে পারফর্মেন্স নিরীক্ষা একটি নতুন সংযোজন। অল্প সময়ের মধ্যেই এই নিরীক্ষা পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে এবং তার যথার্থতা প্রমান করতে পেরেছে। এক্ষেত্রে সকল বিষয়ে নিরীক্ষার প্রভাব, আর্থিক বিষয়, একটি ভাল ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি বিচার করে, অনাকাঙ্ক্ষিত এবং জটিল পরিবেশ, কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির ফলাফল ও প্রভাব, তার দৃশ্যমান্যতা, নিরীক্ষা করার যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানের পারফর্মেন্স নিরীক্ষা করা হয়।

পারফর্মেন্স নিরীক্ষার যথাযথ প্রয়োগের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নিরীক্ষা পরিকল্পনা নেয়া হয়, একটি নিরীক্ষা পূর্ব পরিকল্পনা এবং একটি নিরীক্ষা কালীন পরিকল্পনা করা হয়। এই নিরীক্ষা পরিকল্পনার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেমন- প্রথমত মূল ব্যবস্থাপনাকে সঠিকভাবে বোঝা, তারপর কোন কোন ইস্যু বা এরিয়া তে নিরীক্ষা কার্যক্রম হবে তা শনাক্ত করা, নিরীক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা যাচাই করা, নিরীক্ষার বিষয়গুলোকে বর্ণনা করা, নিরীক্ষার যথার্থতা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র ব্যবহার, পুরো নিরীক্ষার জন্য একটি নিরীক্ষা কর্মসূচি ও এপ্রোচ তৈরি করা। নিরীক্ষার মূল এরিয়া বাছাই করার জন্য কিছু বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যেমন- তাৎপর্য, ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি, নিরীক্ষার প্রভাব ও নিরীক্ষা করার সক্ষমতা। নিরিক্ষা সম্পন্ন হলে একটি নিরিক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পারফর্মেন্স নিরীক্ষার মধ্যে রয়েছে নির্মাণ কাজ নিরীক্ষা, পরিবেশ নিরীক্ষা ইত্যাদি।

তথ্য প্রযুক্তি নীতি

বাংলাদেশের নিরীক্ষায় সুপ্রীম ইনস্টিটিউশনের আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্য নিরীক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। সারা দেশে যেসব প্রতিষ্ঠানের উপরে ওসিএজি নিরীক্ষা করে থাকে সেসব কার্যালয়গুলোতেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দ্রুতই বৃদ্ধি পাওয়ায় সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রমের ক্ষেত্রেও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এই তথ্য প্রযুক্তি কিভাবে ব্যবহার করা হবে সে একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়। নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (সিডা) সহায়তায় সিএজি কার্যালয় তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, প্রিন্টার ক্রয় করা হয় এবং এগুলোর ব্যবহারের জন্য স্টাফদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি নীতিমালায় ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ইমেইল, ইন্টারনেট ব্যবহার নীতি ও এই নীতি মালা প্রয়োগের ফরম সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯]

মিডিয়া হ্যান্ডবুক

মিডিয়ার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সিএজি কার্যালয় কিছু নীতিমালা তৈরি করে যা মিডিয়া হ্যান্ডবুক নামে পরিচিত। এই নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে ওসিএজি কিভাবে ভাল মিডিয়া কভারেজ পাওয়া যাবে তার চেষ্টা করে। ওসিএজির কার্যক্রম, নিরীক্ষার ফলাফল ও সুপারিশ সম্পর্কে সাধারণ জনগণ ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জানানোর জন্য ওসিএজি মিডিয়ার সহযোগীতা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।[২০]

যোগাযোগ কৌশল

---

[১৯] বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org এ ইনফরমেশন টেকনলজি পলিসিজ দেখুন

[২০] বিস্তারিত জানার জন্য বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org এ মিডিয়া হ্যান্ডবুক দেখুন

সিএজি কার্যালয়কে তার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন স্টেহোল্ডারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। এই যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুইভাবেই করতে হয়। কিভাবে সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে সে সম্পর্কে যোগাযোগ কৌশলে উল্লেখ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণসহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কী ধরনের যোগাযোগ করা হবে তা অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ কৌশলে বলা হয়েছে। আবার সিএজি কার্যালয় তাদের কার্যক্রম কি, কিভাবে করা হয়, কিভাবে তাদের কাজ দ্বারা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় ইত্যাদি বিষয় সংসদ, গণমাধ্যম, সরকারি কার্যালয়সহ অন্যান্য বাহ্যিক স্টেকগোল্ডারদের সাথে শেয়ার করা এবং তাদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার যোগাযোগ কেমন হবে তা বাহ্যিক যোগাযোগ কৌশলে বর্ণিত হয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের কমিউনিকেশন সেল কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে তাও এই কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়।

২.৩ সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম

বাংলাদেশ সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে, ওসিএজি প্রধানত ২ ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করার কথা। হিসাব কার্যক্রম ও নিরীক্ষা কার্যক্রম। হিসাব কার্যক্রমটি হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক (সিজিএ) দ্বারা সম্পন্ন করা হয় এবং সিএজি কার্যালয় কর্তৃক মতামত প্রদানের মাধ্যমে তা নিরীক্ষা করে উক্ত প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। তবে সিজিএ কার্যালয় ২০০২ সাল থেকে সিএজি এবং অর্থ মন্ত্রণালয় দুই কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রনেই তার হিসাব কার্যক্রমটি পরিচালনা করে থাকে।

নিরীক্ষা[২১] কার্যক্রম

সিএজি কার্যালয় নিরীক্ষার সকল নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, নিরীক্ষা সম্পাদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই কার্যালয় তার ১০টি অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের প্রায় **৩০ হাজারটি** প্রশাসনিক ইউনিটের হিসাব নিরীক্ষা করে থাকে। নিরীক্ষার মাধ্যমে ওসিএজি যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্বন্ধে অবগত হন। সিএজি কার্যালয় সাধারণত ৪ ধরনের নিরীক্ষা করে থাকে। যথা -১. আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা (ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট) ২. নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরূপণ নিরীক্ষা (কমপ্লায়েন্স অডিট), ৩. পারফর্মেন্স নিরীক্ষা ও ৪. ইনফরমেশন বা তথ্য নিরীক্ষা। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা (ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অডিট)

আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা বলতে সরকারের যেসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাবের বিবরণী তৈরি করা হয় সেগুলোর আয় ও ব্যয়ের যে ক্যাশ বেসিস হিসাব রাখা হয় তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা তার যাচাই বাছাই করা। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে এ্যাক্রুয়াল বেসিসে হিসাব রাখা হয় তাদের হিসাবের বিবরণীতে আর্থিক অবস্থা, ফলাফল ও কার্যকরতা সম্পর্কে পক্ষপাৎহীন ও সঠিক চিত্র দিচ্ছে কিনা তার উপরে মতামত প্রদান করা। এ ধরনের নিরীক্ষা বাংলাদেশে শুধু সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উপরেই করা হয়ে থাকে।[২২]

নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরূপণ নিরীক্ষা (কমপ্লায়েন্স অডিট)

নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরূপণ নিরীক্ষা বলতে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন প্রচলিত নিয়মনীতি, আইনকানুন অনুসরণ করে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণকে বোঝানো হয়। নিরীক্ষা বিভাগের মূল কাজ হচ্ছে, সকল আর্থিক কার্যক্রম যে যথাযথভাবে আইন, নিয়মনীতি, চুক্তি বা অর্থায়নের শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে তা যাচাই করা। এই নিরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হচ্ছে লাভ-ক্ষতি হিসাব, আয়-ব্যয় হিসাব, স্থিতিপত্র, জমি, অপচয়, অন্যান্য স্থায়ী পরিসম্পদ ও চলতি পরিসম্পদ।

পারফর্মেন্স বা ভ্যালু ফর মানি অডিট

১৯৯৯ সাল থেকে পারফর্মেন্স নিরীক্ষা সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা তালিকা প্রকাশ করে থাকে। সিএজি কার্যালয় নিজেদের কাজের যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য এটা অনুভব করে যে, যেহেতু পর্যাপ্ত সম্পদ এবং বাজেটের অভাবে অধিকাংশ পাবলিক কাজই হয়ে থাকে

---

[২১] অডিট কোডে বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে, সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব বহি, অন্যান্য দলিল পত্রাদি, ভাণ্ডার, পরিসম্পদ ইত্যাদির পর্যবেক্ষণের নামই অডিট বা নিরীক্ষা

[২২] গভর্নমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড, বাংলাদেশ মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.cagbd.org

ঋণের মাধ্যমে সেহেতু এই সকল কাজের ক্ষেত্রে যথার্থতা যাচাই এবং অনিয়ম চিহ্নিত করার জন্য স্বাধীনভাবে মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। পারফর্মেন্স নিরীক্ষা জনগণের সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের জন্য আর্থিক ও নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা করে এবং এটা সংসদের কাছেও জবাবদিহিতার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই নিরীক্ষায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যালোচনা করা হয়-

প্রথমত, মিতব্যয়ীতা (Economy)
দ্বিতীয়ত, দক্ষতা (Efficiency)
তৃতীয়ত, ফলপ্রসূতা (Effectiveness)

উপরে উল্লিখিত পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়াল অনুসরণ করে পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তথ্য বা ইনফরমেশন অডিট নামে এক ধরনের নিরীক্ষা পদ্ধতি রয়েছে। তবে এখনও এই নিরীক্ষা নিয়ে কোনো ধরনের কার্যক্রম শুরু হয়নি। তাই এই নিরীক্ষার কোনো নির্দিষ্ট ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা এখনও তৈরি হয়নি। তবে যদি কোনো বিষয়ে আশু নিরীক্ষা প্রয়োজন হয় তবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান যে নিরীক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পড়বে, তার আওতায় একটি বিশেষ নিরীক্ষার ব্যবস্থাও করা হবে।

নিরীক্ষা প্রক্রিয়া

প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচি অনুসারে মাঠ পর্যায়ে কাজ শুরু হয়। এ সময়ে নিরীক্ষা টিম সিএজি কার্যালয় ও অডিট অধিদপ্তরের অডিট কোড ও ম্যানুয়াল অনুসরণ করে থাকে। নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়।

- সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন যথাযথ আইন, নিয়মনীতি, চুক্তি বা অর্থায়নের শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ ও যাচাই বাছাই করা। এসব যাচাই বাছাই করার জন্য নিরীক্ষা টিমগুলো সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভাউচার, নথিপত্র, হিসাবের বহি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরীক্ষা করে থাকে।
- নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্য তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন আকারে প্রধান কার্যালয়ে পেশ করা;
- নিরীক্ষা টিম কর্তৃক দাখিলকৃত প্রাথমিক প্রতিবেদনের পর্যালোচনা করা;
- নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউনিট এবং মন্ত্রণালয়কে তাদের ব্যাখ্যার জন্য অবহিত করা;
- নিয়ম বহির্ভূত লেনদেনকৃত অর্থ আদায়;
- নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত, সম্পাদনা, প্রিন্ট এবং রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা;
- সরকার কর্তৃক প্রদেয় তথ্য নির্দিষ্টকরণ ও পিএসিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান বাছাই

অডিট অধিদপ্তরগুলো কীভাবে, কখন, কোন প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করবে তা একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়। নিরীক্ষার পরিধি ব্যাপক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে প্রতি বছর বা ২-৩ বছর পর পর কোন প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়। নিরীক্ষাযোগ্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিরীক্ষক কম থাকায় টেস্ট চেক এর মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার জন্য বাছাই করা হয়ে থাকে। স্বল্পসংখ্যক লোক দিয়ে নিরীক্ষা কাজ করা সম্ভব নয় বলে প্রতিষ্ঠানের আকৃতি, লেনদেন, বাজেট এবং ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রতিষ্ঠানকে এ, বি, সি তিনটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়।

এ ক্যাডগরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতি বছরই নিরীক্ষা করা হয়।
বি ক্যাডগরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ২ বছরে একবার নিরীক্ষা করা হয়।
সি ক্যাডগরি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতি ৩ বছরে একবার নিরীক্ষা করা হয়।

নিরীক্ষা টিম

সাধারণত একজন নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, একজন এসএএস সুপারিন্টেডেন্ট ও দুইজন নিরীক্ষক- এই ৪ জনের সমষ্টিতে একটি নিরীক্ষা দল গঠিত হয়। নিরীক্ষা কাজের উপর ভিত্তি করে নিরীক্ষা দলের সদস্য সংখ্যা কম বা বেশি হতে পারে। নিরীক্ষা পরিকল্পনা বা কর্মসূচির মত নিরীক্ষা দল গঠনও মহাপরিচালক বা উপপরিচালক কর্তৃক হয়ে থাকে।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের ধাপ ও সময় কাল

অডিট কোড ও ম্যানুয়াল অনুসরণ করে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচি অনুসারে মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কাজ শুরু হয়। মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষা করার বিষয়ে চিঠির মাধ্যমে জানানো হয়। নিরীক্ষা টিম চিঠি দেওয়ার তারিখ অনুসারে অডিটি প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য যান এবং তারা ৩ থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন পর্যন্ত তাদের কার্যক্রমের জন্য ব্যয় করেন।

নিরীক্ষা করার সময় নিরীক্ষা দল সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভাউচার, নথিপত্র, হিসাবের বহি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরীক্ষা করে থাকেন। নিরীক্ষা কার্যে অসামঞ্জস্য তথ্য পাওয়া গেলে নিরীক্ষা চলাকালীন অডিটি প্রতিষ্ঠানের নিকট তা উপস্থাপন করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের সন্তোষজনক উত্তর পেলে তাৎক্ষনিক তা বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু যেসব অসামঞ্জস্য তথ্যের সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায় সেগুলো নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদন আকারে সিএজির সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে পেশ করা হয়। অধিদপ্তর থেকে যাচাই-বাছাই করে কোন অনিয়ম ধরা পড়লে প্রথমত অডিটি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে উপযুক্ত ব্যাখ্যা চেয়ে পুনরায় চিঠি পাঠানো হয় এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও ওসিএজির সাথে নিরীক্ষা আপত্তি নিয়ে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হলে আপত্তিটি প্রত্যাহার করা হয়। অন্যথায় আপত্তিটি ড্রাফট প্যারা গ্রাফ হিসেবে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়।

চিত্র ২.১: নিরীক্ষা কার্যক্রমের ধাপসমূহ

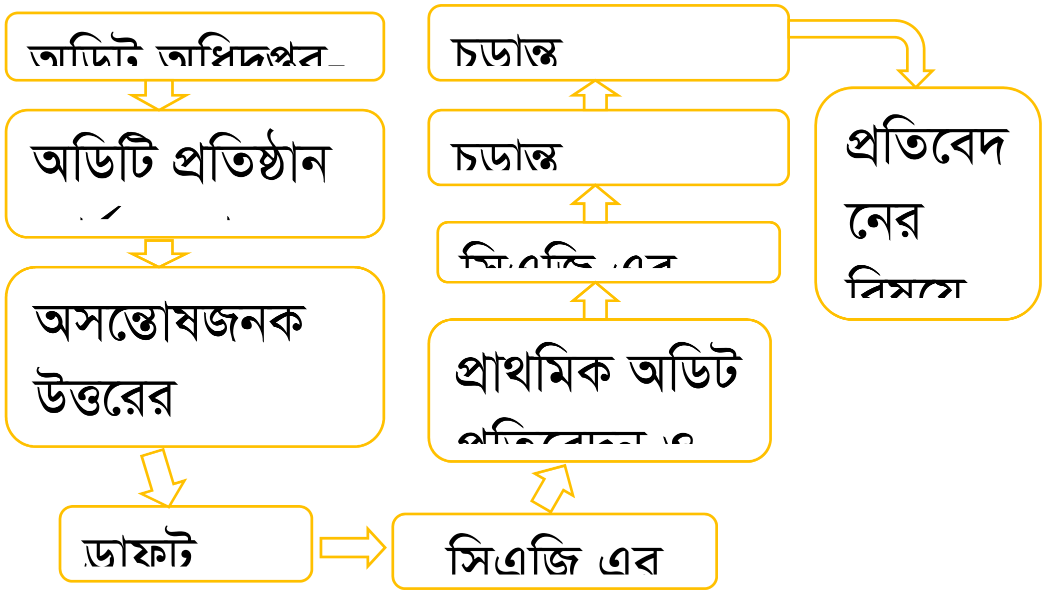

এই ড্রাফট প্যারাগ্রাফ সিএজির যাচাই-বাছাই করার জন্য সিএজির নিকট পেশ করা হয়। সিএজির নিকট পেশ করার পরেও নিরীক্ষা আপত্তির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে চিঠির মাধ্যমে অবহিত করা হয় এবং পুনরায় ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় এবং সিএজি কার্যালয় মিলে তৃপক্ষীয় সভায় আলোচনার মাধ্যমে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি করার চেষ্ঠা করা হয়। এ পর্যায়েও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে আপত্তিগুলো চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন সিএজি কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংসদে পেশ করবেন। পরবর্তী পর্যায়ে সংসদের পিএসি উক্ত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবেন এবং তাদের সুপারিশ প্রদান করবেন।

যেকোনো হিসাব নিরীক্ষা কালে নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন, প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ইস্যুকরণ এবং খসড়া অনুচ্ছেদ চূড়ান্তকরণসহ ওসিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে তার জন্য কোনো ধরা বাধা নিয়ম কোথাও উল্লেখ নেই। তবে সিএজি তার একটি চিঠির মাধ্যমে এসব কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেন।[২৩] কার্যক্রমের বিভাজন অনুসারে অডিট অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সংস্থা এর বরাবর পরিদর্শন প্রতিবেদন তৈরি করা থেকে শুরু করে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সিএজির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ পর্যন্ত সর্বমোট ৯০ কর্মদিবস ধার্য্য করা হয়েছে। নিরীক্ষা কাজ শেষ হওয়ার পর প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয় বরাবর ইস্যু করার জন্য অডিট অধিদপ্তর নির্ধারিত ৯০ কর্মদিবসের অতিরিক্ত আরো ১৫ দিন সময় পায়। তবে এই সময় নির্ভর করে আপত্তির সংখ্যা কম বেশির উপরে। যেসব কার্যালয়ের আকার বড়, ঢাকার বাইরের কার্যালয়ের সংখ্যা বেশি এবং আপত্তির সংখ্যা বেশি সেসব কার্যালয়ের আপত্তির জবাব দেওয়ার জন্য বেশি সময় দেওয়া হয়।

২.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয় অডিট ভবন নামে পরিচিত। নিরীক্ষা ও হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, সমন্বয়, বাস্তবায়ন ও মুল্যায়নে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রককে এই কার্যালয়ের ৩ জন উপ-মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ৪ জন অতিরিক্ত উপ-মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ৪ জন সহকারী মহা নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ সহায়তা করে থাকেন।[২৪]

মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক এর অধীনে ১০টি নিরীক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- বাণিজ্যিক অডিট, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট, সিভিল অডিট, প্রতিরক্ষা অডিট, পূর্ত অডিট, বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিট, মিশন অডিট, ডাক, তার ও দুরালাপনি অডিট, রেলওয়ে অডিট, পারফর্মেন্স অডিট। প্রতিটি অধিদপ্তরের প্রধান একজন মহা পরিচালক। মহা পরিচালকদের কাজে সহায়তা করে থাকেন একজন পরিচালক এবং কয়েকজন উপ পরিচালক। প্রত্যেক উপ পরিচালকের অধীনে একাধিক সহকারি পরিচালক, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, নিরীক্ষক এবং জুনিয়র নিরীক্ষক কাজ করেন। প্রত্যেকটি অধিদপ্তরের নিজস্ব কাজের পরিধি রয়েছে। যেমন- বাণিজ্যিক অডিট মূলত সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহ ও রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ সহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমুহকে নিরীক্ষা করে থাকে। সিএজি তাঁর নিরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষা অধিদপ্তরসমূহকে সংগঠিত করে উপযুক্ত কর্মকর্তাগণকে তাদের কর্তব্যসমূহ নির্ধারণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। নিরীক্ষা অধিদপ্তরগুলো খসড়া নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য সিএজিকে প্রেরণ করে থাকে। সিএজি কার্যালয়, এই কার্যালয়ের ১০টি অডিট অধিদপ্তর এবং ফিমাতে মোট অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩৬৫৫টি একং কর্মরত আছে ২৫৬৩ জন। অধিদপ্তরগুলোতে মোট কর্মকর্তা- কর্মচারী নিযুক্ত আছে ২৩২১ জন।[২৫]

সারণি ২.১: সিএজি কার্যালয়, অধিদপ্তর এবং ফিমার অনুমোদিত ও কর্মরত জনবলের পদের শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণ

কর্মকর্তা- কর্মচারী	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ/অতিরিক্ত	শূন্য ও অতিরিক্ত পদের শতকরা হার
প্রথম শ্রেণি (ক্যাডার)	১৩৫	১২৯	৬	৪.৪
প্রথম শ্রেণি (নন- ক্যাডার)	৩৭৬	৪১৯	৪৩	১১.৪ (অতিরিক্ত)
দ্বিতীয় শ্রেণি	৬৯১	১৮৫	৫০০	৭৩.২
তৃতীয় শ্রেণি	২০৮৩	১৫০৫	৫৭৮	২৭.৭
চতুর্থ শ্রেণি	৩৭০	৩২৫	৪৫	১২.০
মোট	৩৬৫৫	২৫৬৩	১০৯২	২৯.৮

সূত্র: সিএজি কার্যালয়, ২০১৩

[২৩] দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১১ নং ধারা অনুসারে ০৩-০৪-৮৯ তারিখের সিএজি/রি-২/১২৯/১০১(১-৯) নং পত্রের আংশিক সংশোধনপূর্বক সিএজি কর্তৃক অনুমোদন

[২৪] সিএজির সাংগঠনিক কাঠামো পরিশিষ্ট ১ এ দেখুন

[২৫] অধিদপ্তরের কার্যক্ষেত্র ও জনবল সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পরিশিষ্ট ২ দেখুন

২.৫ প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

বিসিএস (অডিট এন্ড একাউন্টস) ক্যাডারের প্রবেশনারদের এবং নন গেজেটেড কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নিরীক্ষা ও হিসাব প্রশিক্ষণ একাডেমী (এএটিএ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এএটিএ দুর্বল ব্যবস্থাপনার জন্য আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হয়নি। হিসাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার লক্ষ্যে সিএজি কার্যালয় তার কার্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে সিএজি কার্যালয় জুন ২০০০ সালে একটি মানব সম্পদ উন্নয়ন সেল প্রতিষ্ঠা করে এবং এ সেলের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিএজি কার্যালয় বর্তমানে কর্মকর্তাদের দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের সুযোগ দিচ্ছে। সময়ের চাহিদা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে এই এএটিএ কে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা) হিসেবে নামকরণ করা হয়। নীচে ফিমা নিয়ে আলোচনা করা হল।

ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী (ফিমা)[২৬]

ফিমার প্রধান হলেন ১ জন মহাপরিচালক। এছাড়া এখানে ২ জন পরিচালক, ৫ জন উপপরিচালক, ১৪ জন নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা প্রশিক্ষক এবং ১৭ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা রয়েছে। এছাড়া ফিমাতে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক অতিথি লেকচারার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন। এখানে অতিথি প্রশিক্ষকদের জন্য আলাদা সম্মানীন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সম্মানীর পরিমাণ ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য লেকচার দেওয়ার জন্য ঘন্টা প্রতি ৫০০ টাকা এবং নন ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য লেকচার দেওয়ার জন্য ঘন্টা প্রতি ৪০০ টাকা। ফিমাতে পরিচালিত নিয়মিত কোর্সগুলো হল:

১. বিসিএস অডিট এ্যান্ড একাউন্টস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ২ বছরর প্রাথমিক মূল্যায়ন (প্রবেশনারস) কোর্স
২. সাবঅর্ডিনেট একাউন্ট সার্ভিস (এসএএস/এসআরএএস) পার্ট- ১ পরীক্ষার ৪ মাসের কোর্স
৩. সাবঅর্ডিনেট একাউন্ট সার্ভিস (এসএএস/এসআরএএস) পার্ট- ২ পরীক্ষার ৪ মাসের কোর্স
৪. অরিয়েন্টেশন কোর্স- গ্রেড ৬ কর্মকর্তা, এসএএস সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং অডিট এন্ড একাউন্টস কর্মকর্তাদের জন্য
৫. অন্যান্য কোর্স- সরকারি বিভিন্ন কার্যালয় কর্তৃক অনুরোধে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ (যেমন - আর্মি কর্মকর্তা, অগ্রণী ব্যাংক, পাসপোর্ট কার্যালয়ে জন্য কোর্স)

২.৬ সংস্কারমূলক কার্যক্রম

সিএজি কার্যালয়ে বর্তমানে দুটি সংস্কারমূলক প্রকল্প চলমান রয়েছে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. স্ট্রেংদেনিং কম্পট্রোলারশিপ অ্যান্ড ওভারসাইট অফ পাবলিক এক্সপেন্ডিচার প্রজেক্ট (স্কোপ)

ক্যানাডিয়ান সিডা অর্থায়নে স্কোপ প্রকল্পটি সিএজি কার্যালয়ের একটি সংস্কারমূলক কার্যক্রম। পাঁচ বছরের এই প্রকল্পের বাজেট হচ্ছে ৭২০ মিলিয়ন টাকা। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হল সিএজি কার্যালয়ের আইনগত এবং সাংবিধানিক যে সকল ত্রুটি রয়েছে তা দূর করা। তিনটি মূল সাংগঠনিক উপাদানের উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রকল্পটি পরিচালিত হয়। উপাদানগুলো নিম্নে উপস্থাপনা করা হলো।

১. প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন বৃদ্ধি
২. জনশক্তি উন্নয়ন
৩. অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি

২. স্ট্রেংদেনিং পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট-বি (স্পেম্প-বি)

এই প্রকল্পটি বিভিন্ন দাতাদের অর্থায়নে এবং বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালনায় শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পটি ২ বছরের জন্য ২০১২ সালে শুরু হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংবিধান অনুসারে সিএজিকে প্রদেয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে ষ্টেকহোল্ডারদের চাহিদা পূরণের জন্য সিএজির দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা। এছাড়া এই প্রকল্পের আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে। যথা

১. কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইনগত কাঠামো বৃদ্ধি করা

[২৬] বিস্তারিত জানতে ফিমার ওয়েবসাইট www.fima.gov.bd দেখুন

২. নিরীক্ষা কার্যক্রমের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং
৩. ফিমাকে একটি আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলোর মাধ্যমে মডেল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সিএজি কার্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. সিএজি কার্যালয়ে কী ধরনের পণ্য এবং সেবা, কোথায় এবং কখন দরকার তা খুঁজে বের করা হয়
২. এই প্রকল্পের আওতায় পারফর্মেন্স নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনার একটি খসড়া আইন (আইএনটিওএসএআই) তৈরি করা হয় যার পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য সিএজি কার্যালয় সহায়তা করে
৩. ওসিএজির কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানের করার জন্য এই প্রকল্প একটি নতুন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের পদক্ষেপ নেয়
৪. সিএজি কার্যালয়ের মানব সম্পদ উন্নয়ন নীতি ও কৌশলী কার্যক্রম পুনঃবিবেচনা ও উন্নত করার কাজে সহায়তা করে
৫. নিরীক্ষা, হিসাব এবং সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়
৬. পিএসি এবং সিএজি কার্যালয়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে
৭. সিএজি কার্যালয়ে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় সকল কার্যক্রম ফলোআপ করার ব্যবস্থা করে
৮. অংশীজন এবং সাধারণ জনগণের বিশ্বাস অর্জনের জন্য ওসিএজি যাতে সময়মত সরকারের কাজের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান করতে পারে, এই প্রকল্প তার জন্য সহায়তা করে

২.৭ সিএজি কার্যালয়ের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে কোন ব্যক্তি সিএজি কার্যালয় সম্পর্কে কোন তথ্য জানতে চাইলে এই আইনের আওতায় আবেদন করতে পারেন। সিএজি কার্যালয়ে এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এই তথ্য প্রাপ্তির জন্য লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। বাংলা বা ইংরেজি- যেকোনো ভাষাতেই আবেদন করা যায়। এই আইনের ধারা-৮, উপধারা-৪ অনুসারে, একজন ব্যক্তিকে এই আবেদন করতে হলে কিছু নিয়ম-নীতি মেনে আবেদন করতে হবে এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত এই ধারায় বর্ণিত আছে। এই আবেদন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমান ফি তথ্য কর্মকর্তার কছে জমা দিতে হয়। আবেদন করার ২০ কর্মদিবসের মধ্যে এই বিষয়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে বাধ্য। এই আবেদন গৃহীত না হলে ১০ কর্মদিবসের মধ্যে তা অবহিত করতে হবে। তবে এই বিষয়ে পুনরায়, ধারা-২৪(১) এর আওতায় আপিল করা যাবে।

২.৮ কল্যাণ সমিতি

সিএজি কার্যালয়ে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তাদের একটি এ্যাসোসিয়েশন রয়েছে যার নাম বিসিএস: **অডিট এন্ড একাউন্টস অ্যাসোসিয়েশন। নন ক্যাডার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিরও আরেকটি এ্যাসোসিয়েশন রয়েছে যার নাম হচ্ছে অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। এছাড়া তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদেরও একটি কল্যাণ সমিতি রয়েছে।** এই কল্যাণ সমিতি তাদের পর্যায়ের (লেভেলের) কর্মকর্তা- কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা, নতুন কোন সুবিধা দেয়া, কোন বিপদে সমর্থন দেয়া তথা কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ করে। এছাড়া প্রতিটি অধিদপ্তরেই কর্মচারীদের সংখ্যার উপরে ভিত্তি করে কর্মচারীদের কল্যাণ সমিতি রয়েছে।

২.৯ ওয়েবসাইট

সিএজি কার্যালয়ের একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। এই ওয়েবসাইটে সিএজি কার্যালয়ের গঠন, কাঠামো, কাজের উদ্দেশ্য, অর্গানোগ্রাম, যোগাযোগের তথ্য, সিএজি এর প্রোফাইল, সংস্কার কার্যক্রম, জনবল, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এই সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে। তবে এখানে অনেক তথ্য হালনাগাদ নয়।

তৃতীয় অধ্যায়
আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

ওসিএজি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারের আইন, বিধি-বিধান এবং প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে সে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, কাজের আওতা, তার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে জবাবদিহিতা, হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষায় স্বচ্ছতা, জনবলের সক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সুবিধার যথাযথ ব্যবহার সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে প্রদেয় দায়িত্ব যথাযথ পালনের উপর। সিএজি কার্যালয় যেসব আইন এবং বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেসব আইন-কানুন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় বিভিন্ন রকমের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা অনেক সময় তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান কোন্ কোন্ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত দুর্বলতার জন্য সিএজি কার্যালয় তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে তা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে।

৩.১ আইনগত সীমাবদ্ধতা

৩.১.১ নিরীক্ষা ও হিসাব বিভাগের পৃথকীকরণ সংক্রান্ত জটিলতা

সংবিধানের, ১৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে মহা হিসাব-নিরীক্ষক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ আকার ও পদ্ধতিতে প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষিত হইবে। কিন্তু ১৯৭৪ এর অ্যাডিশনাল ফাংশনস অ্যাক্ট, ১৯৮৩ তে সংশোধন করা হয়[২৭] এবং সংশোধনে ৩এ তে বলা হয়, সরকার ইচ্ছা করলে ওসিএজির নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষা ক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিক আরও যে সকল ক্ষমতা রয়েছে তা স্থগিত করতে পারে। এই সংশোধনের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে ওসিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাবরক্ষণ কার্যালয় ওসিজিএকে ওসিএজি থেকে আলাদা করে। ওসিএজিকে অবগত না করে বা তার অনুমতি ছাড়া এই সংশোধন করা হয়। আবার সংবিধান পরিবর্তন না করে এই সংশোধন করার ফলে বাস্তবিক অর্থে ওসিজিএকে ওসিএজির নিয়ন্ত্রণ থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না। ফলে সিজিএ কার্যালয় সাংবিধানিক ভাবে এখনও ওসিএজির অধিনস্তই রয়ে গেছে। সিজিএর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তারা ওসিএজির নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। তাদের পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি ওসিএজির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সিজিএর মাধ্যমে নিয়োগকৃত তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীরা পদোন্নতি পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেই তারা ওসিএজির নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। সিজিএর কর্মকর্তাদের তিনটি কর্তৃপক্ষের (ওসিএজি, ওসিজিএ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়[২৮]) নিকট জবাবদিহি করতে হচ্ছে। ভারত ও পাকিস্তানে ওসিএজিকে তার আওতাধীন কার্যালয় ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারের নিরীক্ষা এবং হিসাবের জন্য সকল ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ভারতে রাষ্ট্রপতি সিএজির সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন।[২৯] কিন্তু আমাদের দেশে সংবিধানে প্রদেয় ক্ষমতা ওসিএজিকে পালন করতে দেওয়া হয় না।

৩.১.২ নিরীক্ষা আইনের অনুপস্থিতি

২০০৮ সালে ওসিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য নিরীক্ষা আইন- এর প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা এখন পর্যন্ত অনুমোদন দেওয়া হয়নি। এছাড়াও কোথাও নিরীক্ষা করতে গেলে সেখানকার ত্রুটি নিয়ে নিরীক্ষা আপত্তি দেয়া হয় বা তাদের আচরণে কোনো ত্রুটি থাকলে তা নিয়েও আপত্তি দেয়া হয়। কিন্তু এই সকল আপত্তি শুধুমাত্র আপত্তি দেয়া পর্যন্তই থাকে, পর্যাপ্ত আইন অর্থাৎ নিরীক্ষা আইন না থাকার কারণে পরবর্তীতে এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যায়না।

আবার একটি নিরীক্ষা টিম নিরীক্ষা করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ১০ দিন অবস্থান করে থাকে। কোনো প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করতে গেলে তারা প্রয়োজনীয় তথ্য দেই, দিচ্ছি বলে নিরীক্ষাকালীন বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করে। সংবিধানে বা অন্য কোথাও

---

[২৭] "3A, Expenditure- The Government may, subject to such condition as may be specified therein, direct that all or any of the provisions of this act shall not apply in respect of such Ministry, Division or office of the Government as it may specify".

[২৮] সিজিএ হিসাবরক্ষণের অংশ হিসেবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে কাজ কে

[২৯] Comptroller and Auditor General's (within duties, power and condition of service) Act, 1971, http://latur.nic.in/html/elibrary-new,

এর জন্য কোনোরূপ শাস্তির বিধান নেই বা সিএজি কার্যালয়ের কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা নেই। পূর্বে সামান্য কিছু জরিমানা করা হলেও এখন আর তা করা হয় না। একইভাবে, সরকার ও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে ওসিএজির কাজ ও ক্ষমতা কেমন হবে এ প্রসঙ্গে কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি নাই। কেউ আইন বহির্ভূতভাবে, ভীতিপ্রদর্শন করে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে, ঘুষ প্রদান করে বা অর্থসংক্রান্ত নিয়ম ও কার্যালয় আদেশের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে নিরপেক্ষ নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে বা প্রতিবেদন প্রকাশের সময়কালকে প্রভাবিত করতে চায় বা করে থাকে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নাই। নিরীক্ষা আইন অনুমোদন হলে সিএজি কার্যালয় তার ক্ষমতাগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবে যার দ্বারা সিএজিকে প্রদত্ত সংবিধানের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে। টিআইবি কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ' গবেষণায়ও দেখা গেছে যে, ওসিএজির একটি সুসংহত নিরীক্ষা আইন না থাকার কারণে ওসিএজির কর্মদক্ষতা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৩০]

৩.১.৩ সিএজির মর্যাদা

বাংলাদেশ ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স, ১৯৮৬ অনুসারে, যেকোনো সচিব, পদমর্যাদার দিক থেকে মন্ত্রীপরিষদের সচিবের অধীন। সিএজি নিয়োগ দেয়া হয় একজন সচিব পদস্থ কোন কর্মকর্তাকে। সুতরাং এই দিক থেকে দেখা যায় যে, সিএজি মন্ত্রীপরিষদ সচিবের অধীন। অথচ ওসিএজি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং সংবিধানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে। এখানে উচ্চ আদালতের বিচারপতি এবং সিএজির মর্যাদা সমান রাখা হয়েছে। তাঁদের বাজেট, নিয়োগ, অপসারণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই ধরনের নিয়ম অনুসরণ করা হয়। অথচ ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে উচ্চ আদালতের বিচারপতির মর্যাদা রাখা হয়েছে নবম পর্যায়ে যেখানে সিএজিকে রাখা হয়েছে ৬ ধাপ নীচে ১৫ তম পর্যায়ে। সুতরাং স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সের মাধ্যমে সংবিধান কর্তৃক সিএজিকে প্রদেয় সাংবিধানিক মর্যাদা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিএজির মর্যাদা কমিয়ে দেওয়ার কারণে তাকে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের এক ধরনের অধীনস্থ হয়ে থাকতে হয় যা তার স্বাধীন কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। সরকারের বিভিন্ন সভাগুলোতে যখন মন্ত্রী পরিষদ সচিব সভাপতিত্ব করে তখন সিএজিকে একজন সাধারণ সচিবের ন্যায় মর্যাদা দেওয়া হয়। অথচ সিএজি একটি সাংবিধানিক পদ হিসেবে তার মর্যাদা হওয়া উচিত উচ্চ আদালতের বিচারপতির সমান।

৩.১.৪ প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান

সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, ওসিএজির প্রতিবেদনসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে। অন্যদিকে রুলস অফ বিজনেস ১৯৯৬ এ বলা হয়েছে যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করতে হবে যা সংবিধান পরিপন্থী।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ওসিএজির নিরীক্ষাধীন একটি প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। যেহেতু প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি সেহেতু প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওপরে নিরীক্ষা করে যেসব আপত্তি পাওয়া যাবে তা প্রদানে ওসিএজি নাও সমর্থ হতে পারে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রীকে প্রতিবেদন সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দিয়ে তাঁর নিকট থেকে স্বাক্ষর করে আনা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কোনো সিএজিই এ ব্যাপারে কোনো নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেননি। এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সিএজির সম্পর্ক উন্নয়নের একটি পথ তৈরি হয় এবং বাংলাদেশের হিসাব ও নিরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রতিবেদন প্রদান অনেক পুরোনো হওয়ায় তা নিয়ে কেউ সময় দিতে চায়না। সংবিধান অনুসারে, সিএজি, প্রধান বিচারপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব কোনো ফাইল ছাড়া কোনো ফাইল সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে যাবেনা। অর্থাৎ সিএজির রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন পেশ করার ক্ষমতা রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর নিকট সিএজি প্রতিবেদন পেশ করার প্রয়োজন নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় সেহেতু তাঁকে এই প্রতিবেদন দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বরং তার মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রদান করা সিএজির সাংবিধানিক ক্ষমতাকে লঙ্ঘন করা।

৩.১.৫ সরকারি বিভিন্ন নিয়ম-নীতি ও আদেশে সমন্বয়হীনতা

৩.১.৫.১ বিভাগীয় নিজস্ব নিয়ম মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করায় নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপন

[৩০] আমিনুজ্জামান, এম সালাউদ্দীন এবং খায়ের সুমাইয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ, মে ২০১৪

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোন আর্থিক নিয়ম অনুসরণ করবে তা অর্থ বিভাগের দ্বারা নির্ধারণ করা হয়। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান সরকারি সিদ্ধান্তের কারণেও নতুন নিয়ম কানুন অনুসরণ করে থাকে। যে সকল প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ সরকারি থেকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়েছে তাদের কোম্পানি করার সিদ্ধান্ত সরকারই গ্রহণ করেছে। তারা সরকারি এবং কোম্পানির নিজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয় করে। সরকারি তহবিলের টাকা ব্যবহার হয় পিপিআর অনুযায়ী। অন্যদিকে, কোম্পানির নিজস্ব টাকা ব্যয় হয় বোর্ড অব ডিরেক্টরের নিয়ম অনুযায়ী। কিন্তু ওসিএজি থেকে যারা নিরীক্ষা করতে আসে তারা এই পার্থক্য মানতে চায় না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখালেও তারা আপত্তি উত্থাপণ করে থাকে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে অনেক সময় সম্পর্কের অবনতি হয় এবং নিরীক্ষকদের উপর আস্থা নষ্ট হয়। অন্যদিকে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানকে এই আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য অনেক কাগজপত্র জমা দিতে হয় যা তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যঘাত ঘটায়। আবার একই আপত্তি বার বার উত্থাপন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দেওয়ার পরেও আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে এসব কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনের উপরেও আপত্তি দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। সরকারী পেস্কেলের তুলনায় কোম্পানির ক্ষেত্রে বেতন বেশি দেয়া হয় যা পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনেই হয়ে থাকে। কোম্পানি এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা- কর্মচারীদের বেতনে পার্থক্য আছে, এটি পরিচালিত হয় কোম্পানির কাঠামো অনুসারে। কিন্তু নিরীক্ষকরা তা যাচাই-বাছাই না করে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপন করে। আর নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান একই তথ্য ও নথিপত্র প্রতি বারই নিরীক্ষকদের নিকট প্রদান করে। কিন্তু নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি হয় না।   আর্থিক বিবরনী

একইভাবে সরকারের সাব ডেলিগেশন ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অর্থ মন্ত্রণালয় ইস্যু করে। কিন্তু সরকারের এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি রয়েছে, যার মাধ্যমে সেসব প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং তাদের হিসাবরক্ষণ করছে। সরকার থেকেই এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা নিয়ম তৈরি করা হয়েছে। যেমন রেলওয়ে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের ক্রয়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান কোন নিয়মগুলো (নিজস্ব নিয়ম নাকি সরকারের সাধারণ নিয়ম) অনুসরণ করবে সে বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয় কোনো হালনাগাদ নির্দেশনা দিচ্ছে না। এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের নিজস্ব নিয়মে হিসাবরক্ষণ ও অর্থ ব্যয় করে থাকে। ফলে সরকারিভাবে নিরীক্ষা টিম ওই সব প্রতিষ্ঠানের নিয়ম না মেনে সরকারি সাধারণ নিয়মগুলো কেন মানা হচ্ছে না তার জন্য আপত্তি উত্তাপণ করে। যেমন সরকারেরও ক্রয় সংক্রান্ত অ্যাক্ট পিপিআর রয়েছে। কিন্তু এই দুটি বিভাগের ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব নিয়মও রয়েছে। তারা সরকারি নিয়ম পিপিআর নাকি তাদের নিজস্ব নিয়মটি অনুসরণ করবে সে বিষয়ে সরকার থেকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই বিভাগ দুটি তাদের নিজস্ব নিয়ম মেনে ক্রয় করলে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা টিম তার উপরে আপত্তি উত্থাপন করে। ফলে এই নিরীক্ষা টিম এবং অডিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ধরে আপত্তি মিটছে না এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা হয়রানির শিকার হচ্ছে।

৩.১.৫.২ জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুল (জিএফআর) ও ট্রেজারী রুল (টিআর) হালনাগাদ না করায় হয়রানি

সরকারের বিভিন্ন সময়ে যেসব আদেশ জারি হয় সেগুলো বিএসআর এবং টিআর এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে এশটি নির্দিষ্ট সময় পর পর হালনাগাদ করা হয় না কিংবা এর কোনো আর্কাইভ নেই। ওয়েবসাইটে কিছু আদেশ দেওয়া থাকলেও সকল আদেশ একসাথে নেই। অর্থ মন্ত্রণালয় কিংবা জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আদেশকৃত সকল আদেশ ওয়েবসাইটে কিংবা প্রিন্ট আকারে নেই। ফলে অনেক সময় নিরীক্ষা টিম কিংবা নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান এই আদেশ সম্পর্কে অবগত না থাকায় আপত্তি উত্থাপণ হয় এবং দীর্ঘ দিন ধরে আপত্তি নিষ্পত্তি হয় না। যেমন পেনশন সহজীকরণ বিধিটি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে জারী করা হয়েছে কিন্তু তা জিএফআর এবং সাবসিডিয়ারি রুলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আবার পিপিআর এর যেসব নতুন ধারা যোগ করা হয়েছে তাও এই জিএফআর এ অন্তর্ভুক্ত হরা হয়নি। একইভাবে দৈনিক

বক্স ১: হালনাগাদকৃত নিয়ম না জানানোর কারণে আপত্তি উত্থাপণ

বাংলাদেশী দূতাবাসের জন্য ২০০৬ সালে একটি নিয়ম ছিল যে কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী অসুস্থ হলে শুধু ওষুধ ক্রয়ের জন্য দোকানের ভাউচর জমা দিলেই তার বিল আদায় করা যাবে। ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন জমা দেওয়ার বিষয়ে কিছু উল্লেখ ছিল না। এই নিয়ম থাকায় এই খাতে ব্যাপক পরিমাণ অবৈধ অর্থ ব্যয় দেখানো হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতে নবম সংসদের অর্থ মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলে একটি সিদ্ধান্ত নেয় যে বিদেশে অবস্থানরত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অসুস্থ হলে তাদের ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনসহ বিলের ভাউচর জমা দিতে হবে। অন্যথায় তাদের এ খাতে বিল প্রদান করা যাবে না। কিন্তু কোনো একটি দুতাবাসে এই নিয়মটি জানানো হয়নি। তারা পূর্বের নিয়মেই বিল জমা দেয় এবং অর্থ তুলে নেয়। পরবর্তীতে যখন নিরীক্ষা টিম গিয়ে নিরীক্ষা করে তখন তারা এই খাতে ব্যাপক দুর্নীতি দেখতে পায় এবং আপত্তি উত্থাপন করে উত্তোলনকৃত অর্থ ফেরত দিতে বলে। কিন্তু নিরীক্ষাধীন প্রতিষ্ঠান থেকে বলা হয় যে তাদেরকে এই নিয়ম সম্পর্কে জানানো হয়নি।

ভাতা ও যাতায়াত ভাতা প্রদানের রুল বিএসআর দুই এ যোগ করার প্রয়োজন হলেও তা এখনও করা হয়নি। এ ধরনের আদেশ সংকলন আকারে প্রকাশ না করায় এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকায় বিভিন্ন সময় নিরীক্ষা টিম গুলো আলাদা আলাদা নিয়ম অনুসরণ করে নিরীক্ষা করে। একইভাবে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন আদেশ সঠিক সময়ে না পাওয়ার কারণে পুরোনো নিয়ম অনুসরণ করে হিসাবরক্ষণ করায় নিরীক্ষা টিম এ ধরনের হিসাবের উপরে আপত্তি উত্থাপণ করে থাকে। ফলে তা নিষ্পত্তি হতেও অনেক সময় ব্যয় হয় এবং সরকারি কার্যালয়গুলোও হয়রানির শিকার হয়।

৩.২ সিএজির কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

৩.২.১ প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা

৩.২.১.১ অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা

সংবিধান অনুসারে, সিএজি কার্যালয় স্বাধীনভাবে কাজ করবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সিএজি তার কাজের জন্য শুধু রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। কিন্তু বাস্তবে নিয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম পরিচালনা এবং অন্যান্য বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি হস্তক্ষেপ রয়েছে। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি আইন মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত এবং মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংযুক্ত। কিন্তু রুলস অব বিজনেসে বলা নাই যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর কোন কোন ক্ষেত্রে ওসিএজি নির্ভরশীল বা তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে। বাস্তবে দেখা যায়, ওসিএজিকে যেকোন কাজের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের উপর নির্ভর করতে হয়।

সারিণ ৩.১: অর্থ বছর অনুযায়ী টিএ-ডিএ বাবদ চাহিদাকৃত বাজেট ও প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ

অর্থ বছর	চাহিদাকৃত অর্থ (হাজার)	প্রাপ্ত অর্থ (হাজার)	বকেয়ার পরিমাণ (হাজার)
২০১২-১৩	১৪১২৭৫	১২৬৪৭৫	১৪৮০০
২০১৩-১৪	১৫৭৩০৮	১৩৩৬০০	২৩৭০৮
২০১৪-১৫	১৬০৮০৬	১৫১১২৭	৯৬৭৯

তথ্য সূত্র: সিএজি কার্যালয় ০৪ ডিসেম্বর ২০১৪

ওসিএজির বাজেটের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভর করতে হয়। ওসিএজিকে প্রতি বৎসর একটি বাজেট অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে পেশ করতে হয়। কিন্তু সংবিধানের ৮৮নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ওসিএজির সংযুক্ত তহবিল[৩১] ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে। এই বাজেট সংসদে ভোটের জন্য পেশ করার প্রয়োজন হয় না। এটা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয় এবং মন্ত্রণালয় তা যাচাই-বাছাই করে থাকে। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যয় সুনির্দিষ্ট করা না থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয় অর্থ সংক্রান্ত আইনের বলে এই ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। প্রতি বছর ওসিএজি পরিবহণ ও দৈনিক ভাতা বাবদ যে টাকা বাজেটে উল্লেখ করে অর্থ মন্ত্রণালয় তার থেকে কম অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকে। প্রতি বছরই এক বছরের টিএ-ডিএর বিলের অংশ পরের বছর প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এক কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দুই কোটি ৩৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৯৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা টিএ-ডিএ বিলের অর্থ পরবর্তী বছরে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রদান করা হয়েছে বা হবে। আবার সিএজি কার্যালয় বাজেট না পাওয়ার কারণে কোনো নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে না। পূর্বে ওসিএজি বিশেষ ধরনের নিরীক্ষা করার জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিকট আবেদন করলে তা অনুমোদিত হয়নি।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ওসিএজির প্রয়োজন অনুযায়ী দক্ষ কর্মকর্তা- কর্মচারী (নন ক্যাডার- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির) নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও এর জন্য তাকে অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। সিএজি কার্যালয়ের লোকবল ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৩৬৫২ জন, কিন্তু কর্মরত আছে মাত্র ২৫৬৬ জন। শুণ্য পদগুলোতে ওসিএজি নিয়োগ দিতে পারে না। কারণ নিয়োগের জন্য তাকে অর্থ এবং জন প্রশাসন উভয় মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হয়, যা সময় সাপেক্ষ। আবার ওসিএজি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ নিরীক্ষা যেমন পূর্ত, চিকিৎসা বা প্রকৌশল বিষয়ে নিরীক্ষা করার জন্য চুক্তিতে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন লোক বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করতে পারেন। এই নিয়োগের জন্য যে বাজেট প্রয়োজন তা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে পাওয়া যায়নি। অর্থ মন্ত্রণালয় অর্গানোগ্রামের বাইরের স্টাফের জন্য কোনো অর্থ দিতে চায় না। ফলে বিশেষ ধরনের

[৩১] সংযুক্ত তহবিল হচ্ছে, সরকারের স্বাধীন অংশ বা ব্যক্তিকে বেতন দেওয়ার জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল যা সংসদের পাশ হতে সংসদের ভোটের প্রয়োজন হয় না

নিরীক্ষাগুলো ওসিএজি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে না। এছাড়া কর্মকর্তাদের পদোন্নতি, শিক্ষা সংক্রান্ত ছুটি ও ক্রয় ইত্যাদির সাথে আর্থিক বিষয় সম্পৃক্ত থাকায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এমনকি যেকোনো আইনগত বিষয় ও নিয়মাবলীর ক্ষেত্রেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়।

একইভাবে যেহেতু যেকোনো নিয়োগ, পদোন্নতি, পুনর্গঠন ও সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়ের সাথে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সেহেতু ওসিএজির এই বিষয়গুলোর জন্যও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। এভাবে ওসিএজি অর্থ মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না।

৩.২.১.২ জনবল সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

৩.২.১.২.১ প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব

সিএজি কার্যালয়ের কাজের তুলনায় জনবলের সংখ্যা অনেক কম। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালের পাশকৃত অর্গানোগ্রাম দ্বারাই বর্তমান ওসিএজির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রতি বছরই সরকারের বাজেট ও কার্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেভাবে সিএজি কার্যালয়ের জনবল বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৮৭-৮৮ সালের অর্থ বছরে যেখানে বাজেটের পরিমাণ ছিল ৮৫২৭ কোটি টাকা সেখানে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাজেটের পরিমাণ হচ্ছে ২৫০৫০৬ কোটি টাকা যা প্রায় ২৯.৩৭ গুণ বেশি।[৩২] অন্যদিকে ১৯৮৩ সালে সরকারের জনবল ছিল ৭ লক্ষ যা বর্তমান সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১২ লক্ষে দাড়িয়েছে যা প্রায় দ্বিগুণ (১.৭১গুণ)। এছাড়া প্রতি বছরই অডিটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ সিএজি কার্যালয়ের জনবলের সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি। যে পরিমাণ পদ রয়েছে তার মধ্যেও শূণ্য পদ রয়েছে প্রায় ৩০% যা মোট অনুমোদিত পদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (সারণি ৩.১)। এখানে ক্যাডার কর্মকর্তার পদ রয়েছে মাত্র ১৩৫টি যা মোট পদের মাত্র ৩.৬৯%। অধিদপ্তর অনুযায়ী দেখা যায় বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তর প্রতি বছর প্রায় ৪০০ প্রকল্প নিরীক্ষা করে। কিন্তু এখানে ক্যাডার কর্মকর্তা আছেন মাত্র ১০ জন, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে মাত্র ৬ জন ও স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরে ১২০০০ প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা কাজের জন্য মাত্র ১১ জন ক্যাডার কর্মকর্তা রয়েছে। স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরে মোট ৪০টি নিরীক্ষা টিম রয়েছে। প্রতিটি টিমের যদি একটি প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করতে গড়ে ৭ দিন করে সময় নেয় আর বছরে কার্যদিবস হয় ২৪০ দিন[৩৩] তাহলে মোট ৮৪০টি প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষা করতে পারে যা মোট নিরীক্ষা ইউনিটের মাত্র ১১.৪২%। বাকি প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। নিরীক্ষা করার এই চিত্র প্রায় প্রতিটি অধিদপ্তরের একইরকম।[৩৪] ক্যাডার কর্মকর্তার স্বল্পতার জন্য তারা মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকা তো দূরে থাক, তারা নিরীক্ষকদের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ, সুপারভিশন, মনিটরিং, দিক নির্দেশনা দেওয়া, গুনগত মান বৃদ্ধি ও তত্ত্বাবধানেও সঠিকভাবে সহায়তা করতে পারে না। সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম অনুসারে ২০১২ সালে একটি নতুন অর্গানোগ্রাম তৈরি করে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও তা এখনও অনুমোদন হয়নি।

চিত্র ৩.১: সিএজি কার্যালয়, অধিদপ্তর এবং ফিমার জনবলের কর্মরত ও শূণ্য পদের হার

[৩২] ৪৩ বছরের বাজেট, http://www.dhakatimes24.com/2014/06/05/26594/print, ৩০ অক্টোবর.২০১৪
[৩৩] ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১০৪ দিন সাপ্তাহিক ছুটি এবং সরকারি অন্যান্য ছুটি ২১ দিন বাদ দিয়ে
[৩৪] অধিদপ্তর অনুযায়ী ক্যাডার কর্মকর্তাদের চিত্র দেখার জন্য পরিশিষ্ট ৩ দেখুন

আবার প্রথম শ্রেণির নন ক্যাডার পদে যে পরিমাণ পদ রয়েছে তার তুলনায় বেশি লোক কর্মরত থাকলেও দ্বিতীয় শ্রেণির ৭৩.২% পদ শূণ্য রয়েছে (সারণি ৩.১)। পদোন্নতি সম্পর্কিত জ্যেষ্ঠতা (সিনিয়রিটি) জনিত জটিলতা, এসএএস পরীক্ষায় পাশ না করা ও পাশ করলেও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদনের অভাবে দ্বিতীয় শ্রেণির পদগুলো শূণ্য রয়েছে।

৩.২.১.২.২ পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা

ম্যানুয়াল অফ স্টান্ডিং অর্ডার (এমএসও) এ পদোন্নতি সম্পর্কিত অস্পষ্টতা

সিএজি কার্যালয়ে কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এক ধরনের জটিলতা রয়েছে। এখানে তৃতীয় শ্রেণির (নিরীক্ষক) কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য সাবঅর্ডিনেট একাউন্ট সার্ভিস (এসএএস) নামে একটি পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। এর মাধ্যমে ৩য় শ্রেণি থেকে ২য় শ্রেণিতে পদোন্নতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে সরাসরি শিক্ষানবিশ হিসেবে শর্ত[৩৫] সাপেক্ষে নিয়োগ করারও বিধান রয়েছে। এছাড়াও ওসিএজি কর্তৃক এসএএস পরীক্ষা অব্যাহতির মাধ্যমেও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিছু পদোন্নতি দেওয়া হয়ে থাকে। ম্যানুয়াল অফ স্টান্ডিং অর্ডার (এমএসও)[৩৬] এর মধ্যে কত শতাংশ পরীক্ষা, কত শতাংশ শিক্ষানবিশ এবং কত শতাংশ অব্যাহতির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতি হবে তা উল্লেখ না থাকায় সিনিয়রিটির দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে। ২০০৩ সালে যেসব শিক্ষানবিশ নিয়োগ করা হয়েছে তারা তাদের যোগদানের দিন থেকেই নিজেদেরকে নিয়োগের দিন বলে দাবি করে। কিন্তু এসএএস পরীক্ষা পাশ না করা পর্যন্ত যেহেতু তাদের চাকরি স্থায়ী করার নিয়ম নেই, তাই যারা নিরীক্ষক থেকে এসএএস পরীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদোন্নতি পেয়েছে তাদের মতে শিক্ষানবিসরা তাদের থেকে জুনিয়র। এভাবে এই দুই পক্ষের সাথে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে পদোন্নতিযোগ্য এরকম প্রায় ৯০ জন নিরীক্ষক এই সিনিয়রিটি নিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করে। এই মামলা নিস্পত্তি না হওয়ার কারণে এসএএস পরীক্ষায় পাশ করা স্বত্তেও প্রায় ৬২৫ জন নিরীক্ষক সুপারিন্টেডেন্ট হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণির সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না।

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসি) অনুমোদন না হওয়ায় উচ্চতর স্কেল না পাওয়া

সিএজি কার্যালয়ের কর্মচারীদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে পিএসির অনুমোদন একটি বড় বাধা। যেসব াডিটর এসএএস পরীক্ষায় পাশ করেছে তাদের পদোন্নতির জন্য পাশ করার সাথে সাথে পিএসসি'র অনুমোদনেরও প্রয়োজন হয়। কিন্তু পিএসসির অনুমতি কার্যকর হতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। কখনও কখনও এই অনুমোদন না দিয়ে দীর্ঘ দিন ঝুলিয়ে রাখে। ২০০৩ সালে একটি নিয়োগ বিধি সিএজি কার্যালয় থেকে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও তা এখনও অনুমোদিত হয়নি। যেহেতু ২০০৩ সালের নিয়োগ বিধি এখনও অনুমোদিত হয়নি সেহেতু পিএসসি কোন বিধি অনুসরণ করবে (১৯৮৩ সালের নাকি ২০০৩ সালের) তা পরিষ্কার না হওয়ায় যে কোনো ধরনের পদোন্নতির অুমোদন তারা ঝুলিয়ে রাখছে। ফলে অনেক নিরীক্ষক ও সুপারিন্টেন্ডেন্টই যোগ্যতা অর্জন করলেও পিএসির অনুমোদনের অভাবে উচ্চ স্কেলের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না। যেমন বর্তমানে প্রায় ৫৩৫ নিরীক্ষক ২০০৭ সাল থেকে এসএএস পাশ করলেও পিএসসির অনুমোদনের জন্য তারা প্রথম শ্রেণির এবং ২৫০ জন সুপারিন্টিডেন্ট দ্বিতীয় শ্রেণির সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একইভাবে ১৯৯৮-৯৯ ব্যাচের পদোন্নতি ঝুলে থাকার কারণে তার পরবর্তী পদোন্নতিগুলোও আটকে রয়েছে। তবে এখানে যারা পিএসসির সংশ্লিষ্টদের ঘুষ প্রদান করতে পারে তাদের পদোন্নতি দ্রুত পাশ হয়ে যায়।

৩.২.১.২.৩ নিয়োগের চ্যালেঞ্জ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির নিয়োগের ক্ষেত্রে ওসিএজিকে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মূখীন হতে হয়। প্রয়োজন থাকা স্বত্তেও ওসিএজির দীর্ঘ দিন নিয়োগ করতে পারেনি যদিও সংবিধান অনুসারে তার এই নিয়োগের একচ্ছত্র ক্ষমতা রয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে দীর্ঘ ২০ বছর ওসিএজিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কোনো নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০১২ সালে ১০০০ জন তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির লোক নিয়োগ করতে সমর্থ হয়। এই নিয়োগ দিতে ওসিএজিকে প্রায় ৩ বছর সময় অতিবাহিত করতে হয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নিয়োগ পরীক্ষার আগের দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই পরীক্ষা স্থগিত করতে বাধ্য হয় ওসিএজি। পরবর্তীতে পরীক্ষা হয় ১ বছর পর এবং পরীক্ষা পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হয়। কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা না নিয়ে বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এখনও সিএজি কার্যালয়ে ১০৯২টি পদ খালি রয়েছে।

---

[৩৫] সিএজি কর্তৃক সংঘঠিত এসএএস পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে তাদের নিয়োগ স্থায়ী করা যাবে না। ম্যানুয়াল অফ স্টান্ডিং অর্ডার, জুন, ২০০৭, সিএজি

[৩৬] ম্যানুয়াল অফ স্টান্ডিং অর্ডার, জুন, ২০০৭, সিএজি

৩.২.২ সুযোগ সুবিধার অভাব

স্বল্প বেতন এবং স্বল্প দৈনিক ও যাতায়াত ভাতা

সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষকদের যে বেতন স্কেল (তৃতীয় শ্রেণির) দেওয়া হয় তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা খুবই কষ্টসাধ্য। ফলে নিরীক্ষকরা স্বভাবতই নীতিহীন হতে বাধ্য হয়। এমনকি এই স্বল্প বেতনের কারণে মেধাবীরাও এই পদে কাজ করতে আগ্রহ বোধ করে না। আবার নিরীক্ষা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন এলাকায় তাদের যেতে হয়। কিন্তু হোটেল ভাড়া ও খাওয়া বাবদ যে দৈনিক ভাতা (৬২৫ টাকা) দেওয়া হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। অনেক সময় সরকারি সার্কিট হাউজ বা অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাংলোতে থাকার জায়গা না পেলে এই অর্থ দ্বারা হোটেল বিল এবং খাওয়া পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পরে। আবার যাতায়াতের জন্য শুধু বাস ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরীক্ষা করতে গেলে সব জায়গায় শুধু বাসে যাওয়া সম্ভব হয় না, রিক্সা ও অন্যান্য যানবাহনে ব্যবহার করতে হয়। ফলে তাদের পক্ষে এই স্বল্প অর্থ দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং তারা দুর্নীতির আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

গ্রেডিংয়ে সমস্যা

ওসিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগ্যতার সাথে গ্রেডিং এবং আর্থিক দিকটি সমন্বিত নয়। একই শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওসিএজিতে গ্রেড নিম্ন। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা তৈরি হচ্ছে। সম্প্রতি সিজিএ ও সিজিডিএফ এর গ্রেড ২ থেকে গ্রেড ১ করা হলেও ডিসিএজি-সিনিয়র ও মহাপরিচালক-ফিমার গ্রেড ২ই রয়ে গেছে। ওসিএজি থেকে এই পদগুলোর গ্রেড উন্নয়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠালেও তা এখনও অনুমোদন দেওয়া হয়নি। আবার ওসিএজি কার্যালয়ের অধিদপ্তরগুলোতে যে মহাপরিচালক রয়েছে তাদের গ্রেড হচ্ছে ৩। তারা যখন মন্ত্রণালয়গুলোর সচিবদের সাথে আপত্তি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সভা করেন তখন নিজেদের অবস্থান ব্যাখা করার ক্ষেত্রে এক ধরনের জুনিয়র সিনিয়র দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। মহাপরিচালকগণ যেহেতু সচিবদের চেয়ে এক গ্রেড নিচে অবস্থান করে সেহেতু তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের অবস্থান সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না। অন্যদিকে অনেক মহাপরিচালকরা দীর্ঘদিন ধরে একই পদে রয়েছেন। এমনকি তাদের বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। একই বেতন ও গ্রেড নিয়েই তাদের অবসরে যেতে হচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা বিরাজ করছে। অথচ ২০১৩ সালের জুলাই মাসে প্রশাসন ক্যাডারের পদোন্নতির সুযোগ না থাকলেও যুগ্ম সচিবের ৪৩০টি পদে আরো ৩২৬ জনের পদোন্নতি দিয়ে মোট ১ হাজার ১৩ জন করা হয়। প্রশাসন ক্যাডারের ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাগণ উপ-সচিব পদে পদোন্নতি পেলেও অডিট এন্ড একাউন্টস ক্যাডারের ৯ম ব্যাচের কর্মকর্তাগণও সুযোগ পাচ্ছে না। অন্যান্য ক্যাডারদের সাথে সিএজি কার্যালয়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেডিংয়ের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় কর্মকর্তাগণ দীর্ঘ দিন (১০-১৫ বছর) ধরে নিরীক্ষা এবং হিসাবের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা সত্ত্বেও উচ্চ গ্রেডিংয়ের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা অন্য ক্যাডারে চলে যাচ্ছে। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে তাদের নিরীক্ষা এবং হিসাবের যে দক্ষতা তৈরি হচ্ছে তা আর নিরীক্ষা ও হিসাবের কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

আবার নন ক্যাডার হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মর্যাদা গ্রেড-৯ যা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে ষষ্ঠ গ্রেডে। আর সুপারিনটেনডেন্ট দ্বিতীয় শ্রেণি এবং নিরীক্ষকগণ হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণির। ২০০০ সালে নন ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেড উন্নয়ন করে ৭ম গ্রেডে নেওয়ার সুপারিশ করা হলেও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না হওয়ায় তা আটকে আছে। ১৯৭৩ সালে নিরীক্ষকদের যে পে-স্কেল ছিল ১৯৭৭ সালে তা কমে যায়। সরকারের অন্যান্য বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি পাশ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ চাকরিতে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু ওসিএজির ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। সরকারি নিয়মানুযায়ী চাকরিতে যোগদান করার ৫ বছর পর কিছু বাছাইকৃত কর্মচারী সিলেকশন গ্রেড পায়। নিরীক্ষক পদের জন্য সিলেক্শন গ্রেড এর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ২০/৮/৯৮ সালে তা বাতিল করা হয়। যেখানে নার্স, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার, সমবায় কার্যালয়, সাব রেজিষ্টার দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা সেখানে নিরীক্ষক তৃতীয় শ্রেণির। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্লক সুপারভাইজারকে চার স্কেল নীচ থেকে তৃতীয় শ্রেণিতে আনা হয়েছে এবং একই সাথে সিলেক্শন গ্রেডও প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য প্রতিটি টিমে একজন নন ক্যাডার ৯ম গ্রেডের নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও দুই জন ৩য় শ্রেণির নিরীক্ষক থাকে যারা মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কার্যক্রমটি সম্পন্ন করে। অন্যদিকে তারা নিরীক্ষা করে থাকে কোনো সচিব বা উচ্চ পর্যায়ের

কর্মকর্তাদের। সরকারি বড় বড় প্রকল্পের প্রধান হন কোনো ক্ষমতাবান আমলা। এসব ক্ষেত্রে যখন ৩য় শ্রেণির নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা কাজের জন্য প্রেরণ করা হয় তখন এই উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণ তাদের গুরুত্ব দেয় না এবং নিরীক্ষকরা তাদের অনিয়মের উপরে আপত্তি দিতে ভয় পায়।

ক্যাডার এবং নন ক্যাডারদের বৈষম্য

গ্রেডিংয়ে জটিলতা

সিএজি কার্যালয়ে ক্যাডার কর্মকর্তা ও নন ক্যাডার কর্মকর্তাদের গ্রেডিং নিয়ে এক ধরনের বৈষম্য রয়েছে। সিএজি কার্যালয়ে নন ক্যাডারদের ক্যাডারে পদোন্নতি হতে হলে তা করা হয় নবম গ্রেডে। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে নন ক্যাডারদের ক্যাডারে পদোন্নতি দেওয়া হয় নবম গ্রেডে। ফলে অনেক নন ক্যাডার নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ক্যাডার কর্মকর্তার তুলনায় বেশি বেতন পেলেও গ্রেডের দিক থেকে সিনিয়র না হওয়ায় ক্যাডার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে হচ্ছে। এতে সিনিয়রিটির দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে।

পদোন্নতি জনিত বৈষম্য

আবার ক্যাডার ও নন ক্যাডারদের পদোন্নতির ক্ষেত্রেও একটি জটিলতা দেখা যায়। ক্যাডার কর্মকর্তার ২৭৯ জনের জন্য পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে ১১৯টি। কিন্তু নন ক্যাডার কর্মকর্তার ১০১০টি পদের জন্য পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে মাত্র ৬০টি। ফলে নন ক্যাডার ও ক্যাডার কর্মকর্তাদের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে যা সিএজি কার্যালয়ের কাজের পরিবেশে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নন ক্যাডার কর্মকর্তারা বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিচ্ছে এবং পোস্টার ছাপাচ্ছে। তারা এই দ্বন্দ্বের জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরই দায়ী করছে। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয় নন ক্যাডারদের গ্রেডিংয়ের বিষয়গুলোকে অনুমোদন দিলেও ওসিএজির উচ্চ পর্যায়ের ক্যাডার কর্মকর্তাদের বিরোধিতার কারণে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয় তা অনুমোদন দিচ্ছে না।

প্রণোদনার অভাব

সিএজি কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার অভাব থাকায় অনেক উপরের সারির কর্মকর্তা সিএজি কার্যালয় ছেড়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি কোনো বিভাগে চলে আসেন। কিন্তু এই সকল কর্মকর্তা নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। মেধাবী ও দক্ষ নিরীক্ষকদের বিভিন্ন উৎসাহব্যঞ্জক বিষয় ও প্রণোদনা বা পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকায় তাদের ভাল কাজ করার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায় এবং পেশাদারিত্ব গড়ে ওঠে না। মিশন অডিট ওসিএজির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বেশ উৎসাহের সৃষ্টি করে। কিন্তু মিশন অডিটের জন্য স্টাফদের নির্বাচনের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সমানভাবে এর সুযোগ পায় না। সাধারণত চাকরির বয়সসীমার ভিত্তিতে এই নির্বাচন করা হয়। কিন্তু পারফরমেন্সের ভিত্তিতে এই নির্বাচনটি করা হলে নিরীক্ষকদের মধ্যে দক্ষতার সাথে কাজ করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

আবার সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার ৫০০ কোটি টাকা ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় হয়। কিন্তু এর জন্য নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের কোনো আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা নেই। অথচ অন্যান্য বিভাগের কর্মরতদের জন্য এ ধরনের প্রনোদনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন কাষ্টমস বিভাগে কর আদায়ের জন্য স্টাফদের করের উপরে শতকরা হারে কিংবা এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়া ব্যাংকে কর্মরত যেসব কর্মকর্তা পেনশন প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন তারা ১% ইনসেনটিভ পেয়ে থাকে। পুলিশ বিভাগে মেডেল, পদোন্নতিসহ অন্যান্য প্রনোদনামূলক ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে তাদের মধ্যে ভাল কাজ করার প্রতি এক ধরনের স্পৃহা তৈরি হয়। কিন্তু সিএজি কার্যালয়ে এমন কোনো তথ্য নেই যে কোনো স্টাফের ভাল কাজে স্বীকৃতিস্বরূপ কখনও পদোন্নতি কিংবা বিদেশে পাঠানো হয়েছে।

৩.২.৩ প্রশিক্ষণে সীমাবদ্ধতা

পুরোনো পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান

পূর্বের তুলনায় ফিমার প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। কিন্তু এখনও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই লেকচারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কারণে অংশগ্রহণকারীরা তা খুব বেশি কাজে লাগাতে পারে না। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনাও নেই। হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে এখানে কোনো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। এক্ষেত্রে কানাডার প্রশিক্ষণকে অনুসরণ করা যায়। কানাডাতে প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে নিরীক্ষা টিমের সাথে নিরীক্ষকদের যুক্ত করে হাতেকলমে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ফিমা কর্তৃক প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণে সমস্যা

ফিমা থেকে যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেগুলো স্টাফদের প্রয়োজন আছে কি না তা যাচাই করা হয় না। এখান থেকে যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার বেশির ভাগই ফিমা কর্তৃপক্ষ থেকে নির্ধারণ করা হয়। ফলে এই প্রশিক্ষণের জ্ঞান স্টাফরা খুব বেশি কাজে লাগাতে পারে না। আবার যে বিষয়গুলোর উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দীর্ঘ দিন যাবৎ তার সিলেবাস হালনাগাদ করা হয় না। একই ধরনের প্রশিক্ষণ বার বার প্রদান করা হয়। রুটিন বাধা কিছু প্রশিক্ষণ যেমন প্রাথমিক মূল্যায়ন কোর্স, এসএএস -পার্ট ১ ও ২, অরিয়েন্টেশন কোর্স এবং পারফরমেন্স অডিট কোর্সই শুধু ফিমার মাধ্যমে দেওয়া হয়। নিরীক্ষা কার্যক্রম ও প্রতিবেদনের মান উন্নয়নে আলাদা করে কোনো প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। প্রশিক্ষণের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কখনও কখনও ফিডব্যাক নেওয়ার হলেও সেই ফিডব্যাক অনুসারে পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

আবার বর্তমানে সিজিএর হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমানে হিসাব পদ্ধতিতে ১৩ ডিজিটসম্পন্ন অডিট কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু ওসিএজির নিরীক্ষকদের এ বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নাই। অথচ সরকারি কার্যালয়গুলো বর্তমানে সিজিএর নিয়ম অনুসরণ করেই তাদের হিসাবরক্ষণ করছে। যেহেতু ওসিএজির নরীক্ষকদের এই হিসাবরক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে সেহেতু তারা অনেক সময় না জেনেই আপত্তি উত্থাপণ করছে যা নিয়ম সম্মত নয়।

প্রশিক্ষকদের যোগ্যতার ঘাটতি

ফিমাতে যারা প্রশিক্ষণ প্রদান করেন তাদের অনেকেরই যোগ্যতার বিশেষ ঘাটতি রয়েছে। অনেকেই এই প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রতি আগ্রহী নয়। সাধারণত যেসব কর্মকর্তাদের এখানে পদায়ন দেওয়া হয় তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয় না। বরং এক ধরনের শাস্তিস্বরূপ পদায়ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যাদের তদবির করার লোক নেই সেসব কর্মকর্তাদের এখানে পদায়ন দেওয়া হয় বলে মূখ্য তথ্যদাতাদের মত। এখানে কিছু অতিথি লেকচারের মাধ্যমেও লেকচার প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে তারা পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না। অন্যদিকে তাদেরকে যে পরিমাণ সম্মানী দেওয়া হয় তার পরিমাণ অনেক কম হওয়ায় ভাল প্রশিক্ষক পাওয়াও যায় না।

প্রশিক্ষণের সময় সীমিত

প্রকল্পের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সেগুলো বর্তমান ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে এই প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। সাধারণত প্রশিক্ষণগুলো ৩ থেকে ৭ দিনের হয়ে থাকে। এই স্বল্প সময়ে চর্চার সুযোগও খুব কম থাকে। ফলে স্বল্প সময়ে কোনো কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগানো সম্ভব হয় না।

প্রশিক্ষণের জন্য যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা না দেওয়া

ফিমা কর্তৃক যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার জন্য অংশগ্রহণকারীদের ফিমা থেকে ভাতা দেওয়া হয় না বলে এই প্রশিক্ষণের প্রতি সকলেরই আগ্রহ কম। তবে প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাতে ভাতা প্রদান করায় তার প্রতি সকলেরই আগ্রহ থাকে।

৩.২.৪ জবাবদিহিতায় সমস্যা

সিএজির জবাবদিহি করার প্রক্রিয়া অনুপস্থিত

সংবিধানে সিএজির নিয়োগ রাষ্ট্রপতির দ্বারা হবে কিন্তু সিএজি তার কাজের জন্য কার নিকট জবাবদিহি করবে তা কোথাও উল্লেখ নেই। ওসিএজির কার্যক্রম ও প্রতিবেদন নিয়ে সংসদে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও কখনই তা আলোচনা হয়নি। তবে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) ওসিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু পিএসি ওসিএজির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবের প্রতিবেদন কিংবা নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা করেনা। ওসিএজি বাৎসরিক কতটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দিবে, কবে দিবে বা তার অন্যান্য যেকোনো কার্যক্রমের জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। সিএজি কার্যালয়ের আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ২০০৯-১০ সালে এক অডিট অধিদপ্তর অন্য অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা পরিচালনা করলেও বর্তমানে তা বন্ধ আছে। তাছাড়া যেহেতু এই নিরীক্ষা ওসিএজির ভিতরকার কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হত তাই এর তেমন কোনো কার্যকরতা নেই। সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সিএজি কার্যালয় কর্তৃক করা হলেও সিএজি কার্যালয়ের কোনো নিরীক্ষা হয় না।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাদিহিতা নিশ্চিতকরণে সমস্যা

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সিএজি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না। শুধু কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা সিএজি বা মহাপরিচালকদের নাই। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্মকর্তাগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সিএজি তাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের নিরীক্ষা কাজ সঠিকভাবে না করা বা নিরীক্ষার মান খারাপের জন্য মহাপরিচালকদের পক্ষে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। যেহেতু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জানে যে তাদের ভুল কাজ, দুর্নীতি করা বা সঠিকভাবে নিরীক্ষা না করার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না সেহেতু তারা দুর্নীতি করতে উৎসাহ পায়। আবার সিজিএ কার্যালয়ে যেসব কর্মকর্তা কাজ করছে তারা আসলে কাদের নিকট জবাবদিহি করবে তা পরিষ্কার নয়। তারা কি অর্থ মন্ত্রণালয়, সিজিএ এবং সিএজির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে তা পরিষ্কার না থাকায় তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

ওসিএজি দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পদায়ন দিতে পারলেও চূড়ান্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগে। ১৯৮৮ সাল থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদোন্নতি হয় জন প্রশাসন (পূর্বের সংস্থাপন) ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডিপাটমেন্টাল প্রোমোশন কমিটি (ডিপিসি)'র মাধ্যমে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, জন প্রসাশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাকে ওসিএজির পক্ষে অমান্য করা সম্ভব নয়। যদিও সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে সিএজিকে তার কার্যালয়ের কাজ সংক্রান্ত একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু ডিপিসির মাধ্যমে পদোন্নতি হওয়ার কারণে সিএজি অধিনস্তদের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারাচ্ছে।

অকার্যকর অভিযোগ সেল

ওসিএজিতে সকল ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি বা অন্য যেকোনো বিষয়ে অভিযোগ করার জন্য একটি অভিযোগ সেল রয়েছে যেখানে একজন কর্মকর্তাকে অভিযোগ গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলো কিছুই জানে না। ফলে সিএজি কার্যালয় দ্বারা দুর্নীতির শিকার হলেও এই অভিযোগ সেলে কখনও কোনো অভিযোগ করেনি। একইভাবে সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই সেল গঠন করা হলেও কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কখনও কোনো বিষয়ে অভিযোগ করেনি। ফলে এই সেল থাকলেও এর কোনো কার্যকরতা নাই।

৩.২.৫ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরিতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত

ওসিএজি কর্তৃক যে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় তা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। দেশব্যাপী যে নিরীক্ষা কার্যক্রম চলে তার সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে প্রতিবেদন তৈরি। বাংলাদেশের জনগণের অর্থ ব্যয়ের হিসাব জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর) ও ট্রেজারী রুলস (টিআর) অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। সরকারের অর্থবিভাগ এই নিয়ম-নীতি পরিবর্তনের এখতিয়ার রাখে। তবে কিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ তাদের হাতে অর্পিত ক্ষমতাবলে আর্থিক বিষয়ে কার্যালয় আদেশ ইস্যু করতে পারে। কিছু আর্থিক নিয়ম অনেক দিনের পুরানো হওয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং এগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে আর্থিক অনিয়ম হয়ে থাকে। কিন্তু নিরীক্ষকরা যখন নিরীক্ষা করতে যায় তখন এগুলো আপত্তি আকারে উঠে আসে। পরবর্তীতে যখন সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে এই

আপত্তির প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় এবং যে ধরনের নথিপত্র পাঠানো হয় সেগুলো এত বেশি অস্পষ্ট হয় যে নিরীক্ষকদের পুনরায় ব্যাখ্যা চেয়ে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে পাঠাতে হয় এবং এর জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কার্যালয় থেকে পাঠানো যুক্তি আর্থিক নিয়মের সাথে বিরোধপূর্ণ হয়। এভাবে নিরীক্ষা বিষয়ে সরকারি কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। ফলে নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন করা যায় না। আবার প্রতিবেদন তৈরি হলেও তা ছাপানোর জন্য অনেক সময় বিজি প্রেস এর সিডিউল পেতে দেরি হয়। ফলে প্রতিবেদন প্রকাশেও দেরি হয়।

আবার নিরীক্ষার নিয়মানুযায়ী নিরীক্ষা হয় সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থ বছরের উপর। কিন্তু নিরীক্ষকরা বেশির ভাগ সময় সম্প্রতি শেষ হওয়া অর্থ বছরের সাথে সাথে অনেক আগের কোন অর্থ বছরের কাগজপত্রের উপরেও আপত্তি দেয়। ফলে এই সকল আপত্তির উত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘ সময় চলে যায় এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে তা অন্তর্ভুক্ত করতেও অনেক দেরি হয়। একই ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে এসব আপত্তি অন্তর্ভুক্ত করায় যখন তা পিএসির সভায় আলোচনার জন্য দেওয়া হয় তখন পুরোনো হওয়ার জন্য এসব আপত্তি গুরুত্ব হাড়ায়।

আবার অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সময় মতো তৈরি হলেও সিএজি কার্যালয়ের কোয়ালিটি এসিউরেন্স টিম দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দীর্ঘ সময় চলে যায়। ফলে প্রতিবেদন তৈরিতে দেরি হয়। বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তরের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে কোনো কোনো প্রতিবেদনের উপরে মতামত দিতে কোয়ালিটি এসিউরেন্স টিমের ১ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত করার তথ্য পাওয়া যায়।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সরকারের কাজের সাফল্য বা ঘাটতির বিষয়ে উল্লেখ না থাকা

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সাধারণত আর্থিক লেনদেনে নিয়মের বাইরে খরচকৃত অর্থ ও ঘাটতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এই প্রতিবেদনে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থে কতটুকু সাফল্যের সাথে কাজ করা হয়েছে বা কতটুকু ঘাটতি রয়েছে সেই বিষয়গুলোর কোনো তথ্য থাকে না। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর পারফরমেন্স নিরীক্ষা প্রতিবেদনে কিছুটা সাফল্য বা ঘাটতির বিষয় উল্লেখ থাকলেও এই ধরনের নিরীক্ষার সংখ্যা অনেক কম।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভুল থাকা

নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত করার জন্য ৬০ থেকে ৯০ দিন সময় দেওয়া হয়। এ জন্য সঠিক তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন জরুরী। ওসিএজি তার কৌশলগত পরিকল্পনায় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন কে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু পর্যাপ্ত নিরীক্ষা ব্যবস্থাপক না থাকায় কার্যকরী তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন সম্ভব হয় না। আর এই তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ছাড়াই নিরীক্ষা প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়। ফলে এই প্রতিবেদনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভুল থেকে যায় কিংবা অগুরুত্বপূর্ণ আপত্তিগুলোও প্রতিবেদনে চলে আসে। পিএসি'র সভায় যখন এই আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয় তখন পিএসি তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে বলে উল্লেখ করে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে দীর্ঘসূত্রতা

সিএজি কার্যলয়ের সকল অধিদপ্তরের প্রতিবেদন একত্রিত করে প্রতি ছয় মাসে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে থাকে। কত দিনের মধ্যে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করতে হবে সে বিষয়ে কোনো লিখিত সময়সীমা নেই। প্রতিবেদন চূড়ান্ত হওয়ার পরেও প্রায় ছয় মাস লেগে যায় সংসদে এটা পেশ করতে। একটি প্রতিবেদন অধিদপ্তর থেকে চূড়ান্ত হয়ে সিএজি এবং সংসদে যেতে যেতে প্রায় এক বছর লেগে যায়। সংসদে পৌছানোর পূর্বে একটি প্রতিবেদন প্রথমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় হয়ে যেতে হয়। ফলে সংসদে পৌছাতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। যদি প্রতিবেদনে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বড় কোন আপত্তি থাকে তাহলে সংসদকে এক বছর অপেক্ষা করতে হয় এই বিষয়ে আলোচনা শুরুর জন্য। যদিও সংসদে কখনই ওসিএজির প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে না। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষে প্রাধান্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ আপত্তির সংখ্যা এতই বেশি থাকে যে, সেগুলো সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পক্ষে প্রাধান্য করা সম্ভব হয় না। স্থায়ী কমিটির পূর্ববর্তী নিরীক্ষা প্রতিবেদনের আপত্তি নিয়ে আলোচনা করতেই দীর্ঘ সময় চলে যায়। ফলে সময় মতো আপত্তি নিয়ে আলোচনা হয় না।

৪.২.৬ তথ্য প্রকাশ প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধতা

সিএজির প্রতিবেদনের তথ্য মিডিয়া সেলের মাধ্যমে জনসম্মুক্ষে নিয়ে আসার কথা থাকলেও তা কার্যকর নয়। যদিও ওসিএজিতে একটি মিডিয়া সেল রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য ওসিএজি প্রতিবেদনে উঠে আসলেও তা মিডিয়াকে প্রকাশ করা হয় না। রাষ্ট্রপতিকে প্রতবেদন প্রদানের পরে জনগণকে জানানোর জন্য ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর মাসের পূর্বে কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত না। ২০১৪ সালের ২৪ নভেম্বর প্রথম বারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওসিএজি প্রতিবেদন জনসম্মুক্ষে নিয়ে আসা হয়। আবার ওয়েবসাইটে যেসব প্রতিবেদন প্রদান করা হয় সেগুলো অনেক পুরোনো। সর্বশেষ প্রতিবেদনগুলো ওয়েবসাইটে নেই। ওসিএজির ওয়েবসাইটে ২০০৮ সালের পরের কোনো প্রতিবেদন দেওয়া নেই। অথচ বর্তমানে ২০১৪ সাল চলছে। আবার এই প্রতিবেদনগুলোতে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলো আরো পুরোনো। ফলে পিএসির পক্ষে প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হলেও দুর্নীতি বা আত্মসাৎের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে ধরা হঠিন হয়ে পরে। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওয়েবসাইটে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওসিএজির ওয়েবসাইটের স্ক্রলারের মাধ্যমে ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানানো হয়। ওসিএজির প্রতিবেদনের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দুর্নীতির দায়ে জেলে পর্যন্ত প্রেরণ করার তথ্য পাওয়া যায়। অথচ বাংলাদেশে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় না। আবার ফিমা কর্তৃক যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তার তথ্য ২০০৯ সালের। এর পরে যেসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা ওয়েবসাইটে নেই।

৩.২.৭ সংস্কারমূলক কার্যক্রমে সমস্যা

ওসিএজির কার্যক্রম ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়নে যে সকল প্রকল্পগুলো নেওয়া হয় সেগুলো কিছু ক্ষেত্রে সফল হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা রয়েছে। বেশির ভাগ সময়ে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় তা ওসিএজি থেকে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে মন্ত্রণালয় থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রকল্পগুলোতে যে পরামর্শক নিয়োগ করা হয় তাদের বেতন বাবদই অর্থের একটি বড় অংশ চলে যায়। যেমন স্পেম্ব ২ এর ক্ষেত্রে শর্তই ছিল ৬০% অর্থ পরামর্শককে দিতে হবে। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পগুলো কাজ করার কথা সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। যেসব বিদেশী পরামর্শক নিয়োগ করা হয় তাদের আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খুব ভাল দক্ষতা না থাকার কারণে তারা অনেক সময় এমন কিছু সুপারিশ করে যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যুক্তিযুক্ত নয়। তারা বেশির ভাগ সময় তাদের দেশের প্রচলিত নিয়ম-কানুন বাংলাদেশে প্রয়োগ করার সুপারিশ করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই তা কার্যকর করা সম্ভব হয় না। যেমন -বাংলাদেশের মতো দুর্নীতিগ্রস্থ দেশে প্রিঅডিট তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হলেও তা এখানে কার্যকর করা সম্ভব নয়। কারণ প্রিঅডিট তুলে দিলে দেশের আর্থিক ব্যয়ে আরো বেশি বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। একইভাবে সিএজি কার্যালয়কে পোস্ট অডিট করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালি না করেই নিরীক্ষা এবং হিসাব বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশও পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার এমন অনেক বিদেশী পরামর্শকও নিয়োগ দেওয়া হয় যাদের প্রকল্পের কার্যক্রমের বিষয়ে কোনো ধারণাও থাকে না। ফলে বাংলাদেশে দিনের পর দিন অবস্থান করলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতি তাদের কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। ওসিএজির প্রকল্পে এমন পরামর্শকও নিয়োজত ছিল যারা ৩-৪ মাস বাংলাদেশে থাকার পরে সঠিকভাবে কার্যক্রম না করার জন্য সংশ্লিষ্ট দাতাসংস্থা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

আবার প্রকল্পের ক্ষেত্রে যেসব পরামর্শক নিয়োগ করা হয় তাদের নিয়োগের কোনো বিধিমালা ওসিএজিতে নেই। ফলে যেসব পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয় তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যাদের দীর্ঘদিন ধরে হিসাবরক্ষণ কিংবা নিরীক্ষা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ততা নেই। এছাড়া প্রকল্পে এসব পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা যাচাই না করে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হয়। কম্পিউটার চালাতে না জেনেও আইটি পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার মত ঘটনা ওসিএজি প্রকল্প কার্যালয়ে ঘটার তথ্য পাওয়া যায়। বেশির ভাগ প্রকল্পের অর্থ তাদের বেতনে চলে যায়। সাধারণত তাদের ১ থেকে ৩ লক্ষ টাকা বেতন দেওয়া হয়ে থাকে। বেশির ভাগ সময় তারা ব্যাক্তিগত কাজ যেমন শেয়ার বাজার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের দক্ষতার বিশেষ ঘাটতি রয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে তারা হিসাবরক্ষণ পর্যন্ত জানে না। বর্তমানে যে ধরনের পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয় তারা সে বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকে না। যেমন- বর্তমানে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টান্ডার্ড ফর সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউশন (আইএসএসএআই) এর উপরে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে পরামর্শকের সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই। তারা প্রকল্পের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে খুব দক্ষতা ও সফলতার সাথে কাজ করতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে এফএমআরপি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা যায় যেখানে এমটিবিএফ এর উপরে নিরীক্ষা করার কথা থাকলেও তা করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেই নিরীক্ষা প্রতিবেদন সংসদে জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

আবার প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব প্রশিক্ষণ দেওয়া তার জন্য প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ে কোনো নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় না। খুব তারাহুরো করে সময় পার হয়ে যাচ্ছে বলে নিম্ন পর্যায়ের কিছু কর্মকর্তা ডেকে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যেগুলো কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। বাজেটের তুলনায় বেশি টাকা খরচ করে পরবর্তীতে তা উত্তোলন করে নেওয়া হয়।

৩.৩ ওসিএজির কার্যক্রম ফলপ্রসু না হওয়ার (নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি ও অর্থ আদায়ে) বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ

৩.৩.১ অডিটকালীন সরকারি কার্যালয়গুলোর অডিট টিমকে সহায়তা না করা

সিএজি কার্যালয় যখন বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় নিরীক্ষা করতে যায় তখন তারা বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মূখীন হয়। ফলে তারা তাদের নিরীক্ষা কার্যক্রমটি অনেক সময় সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়। প্রায়ই দেখা যায়, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নির্ধারিত সময়ে আর্থিক বিবরণি তৈরি করতে পারে না, সঠিকভাবে আর্থিক হিসাব তৈরি করে না, ক্যাশ বই সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে না, নিরীক্ষার জন্য সুবিধাজনকভাবে নথিপত্র রাখে না ইত্যাদি। নিরীক্ষা করার বিষয়ে পূর্বেই সরকারি কার্যালয়গুলোকে অবহিত করা থাকলেও প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিতে বিলম্ব করে। আবার অনেক সময় জাল ভাউচার দেখায় যার সত্যতা যাচাই করা সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। ফলে ওই স্বল্প সময়ে তা প্রায়ই যাচাই করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা এর জন্য আপত্তি উত্থাপন করতে বাধ্য হয়। কখনো কখনো দেখা যায় সংশ্লিষ্ট স্টাফের হিসাব রক্ষকের প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ঘাটতি থাকায় নিরীক্ষার বিষয়ে তথ্য পত্রাদি সঠিকভাবে দিতে ব্যর্থ হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীর দায়িত্বের বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকার কারণে নিরীক্ষায় বের হয়ে আসা অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে অনেক সময় নির্দোষ ব্যক্তিও দোষী হয়ে যায়।

আবার গভমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড উল্লেখ রয়েছে যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদন আনকোয়ালিফাইড বা কোয়ালিফাইট কিনা।[৩৭] যখন যথেষ্ট পরিমাণ নথিপত্র দেখে নিরীক্ষা টিমগুলো আপত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়ে আপত্তি উত্থাপন করে তখন তাকে আনকোয়ালিফাইড মতামত বলা হয়। এছাড়াও আরো তিন ধরনের মতামত যেমন-কোয়ালিফাইড, এ্যাডভারস ও ডিসক্লেইমার হিসেবে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে পারে। কিন্তু নিরীক্ষা টিমগুলো প্রয়োজনীয় নথিপত্র না পেলেও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতায় আসার কারণে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে-কোয়ালিফাইড, এ্যাডভারস ও ডিসক্লেইমার হিসেবে মন্তব্য করতে অনিহা করে। ফলে নিরীক্ষায় আসল চিত্র উঠে আসে না।

৩.৩.২ মন্ত্রণালয়ের মতামত যথাসময়ে না পাওয়া ও পিএসির সুপারিশ পালন না করা

সিএজি কার্যালয় কর্তৃক নিরীক্ষা শেষ করার পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মতামত ৯০ দিনের মধ্যে দেয়ার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করা হয়। কখনও কখনও মন্ত্রণালয় থেকে জবাব আসতে দেরি হয়, এমনকি কখনও কখনও মন্ত্রণালয় থেকে কোনো জবাবই দেওয়া হয় না। বার বার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়গুলো জবাব পাঠায় না। এর ফলে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি করতে অনেক সময় চলে যায় এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। এখানে উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলো যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেনা। সাধারণত মন্ত্রণালয়গুলোর স্টাফদের বদলি হওয়ার কারণে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে নিরীক্ষা আপত্তি দেওয়া হয় তারা আর মন্ত্রণালয়ে না থাকায় উত্তর প্রদান করতে দেরি হয় কিংবা উত্তর দেওয়াও হয় না। এই ব্যাপারে পিএসির প্রতিবেদনে মন্ত্রণালয়গুলোকে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করলেও তেমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। ফলে দীর্ঘ দিন ধরে বিপুল সংখ্যক নিরীক্ষা আপত্তি মন্ত্রণালয়গুলোতে নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে একটি মন্ত্রণালয়ের তথ্য উল্লেখ করা যায়। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ে মোট ১ লক্ষ ৫২ হাজার আপত্তি নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। এভাবে আপত্তি দীর্ঘ দিন পূরোনো হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে ওসিএজি কর্তৃক উত্থাপিত নিরীক্ষার আপত্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। আবার পিএসি যদি মন্ত্রণালয়কে আত্মসাৎকৃত কোনো অর্থ আদায়ের সুপারিশ করে, আর মন্ত্রণালয়গুলো আদায় করতে ব্যর্থ হয় তখন ওসিএজির কার্যক্রম অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৩.৩.৩ সরকারি স্থায়ী সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (পিএসি)'র ভূমিকা

সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম তখনই ফলপ্রসু হয় যখন তা পিএসি কর্তৃক আলোচিত হয়ে নিস্পত্তি করা হয় বা আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলোতে উল্লেখিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার দীর্ঘ দিন পরে প্রতিবেদনগুলো সংসদে জমা দেওয়ায় তা নিস্পত্তিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন ২০০৮-০৯ এর প্রতিবেদন ২০১২[৩৯] সালে জমা দেওয়ার কারণে নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট অনেককেই আর জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। ফলে এই আপত্তিগুলোতে যে অনিয়মের উল্লেখ থাকে তা আর নিস্পত্তি হয় না বা অর্থ আত্মসাৎ হলে তা আর আদায় করা সম্ভব হয় না।

সারণি ৩.২: আলোচিত নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংখ্যা*[৩৮]

আলোচনাকারী পিএসির নাম	সংখ্যা
১৯৭২ সাল থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত	৩৩২
নবম সংসদ কর্তৃক আলোচিত	৫৭০
অনালোচিত	৭৮
মোট	**৯৮০**
নবম পিএসি কর্তৃক ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে মিমাংশার জন্য সুপারিশকৃত	২২৪

আবার পিএসিতে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন ধরে তা আলোচনা না হওয়ায় এই নিরীক্ষা আপত্তিগুলো আর সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হয় না। নবম সংসদের পিএসি ছাড়া কোনো পিএসিই এই নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেনি। ১৯৭২ সাল থেকে নবম পিএসি গঠন হওয়ার পরে মোট ৯৮০টি নিরীক্ষা প্রতিবেদন নবম পিএসি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

---

[৩৭] গভর্নমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড, চাপ্টার ৪, ৪.১.৫ থেকে ৪.১.১০ অনুচ্ছেদ। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথিপত্র না দেখে যখন অডিট আপত্তি দেওয়া হয় তখন তাকে কোয়ালিফাইড মতামত বলা হয়। যখন নথিপত্র দেখে কোয়ালিফাইড মতামত দেওয়া সম্ভব হয় না তখন নিরীক্ষা টিমগুলো এ্যাডভারস মতামত প্রদান করে। আর যখন নথিপত্রের সংখ্যা এতটাই কম থাকে যে এ্যাডভারস মতামত প্রদান করাও সম্ভব হয় না তখন সেই অডিটকে ডিসক্লেইমার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

[৩৮] নবম জাতীয় সংসদেও সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির চতুর্থ প্রতিবেদন, অক্টোবর, ২০১৩

[৩৯] Riview of the Methodology of Reduction of Audit review backlock by Public Accounts committee, 9th Parliament of Bangladesh, 27 June 2012

স্বাধীনতার পর থেকে অষ্টম সংসদ পর্যন্ত মাত্র ৩৩২টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়। নবম সংসদের পিএসি পুরোনো ৪৯০টি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করে যেখানে ১২৭৬৫টি নিরীক্ষা আপত্তি ছিল এবং তার আর্থিক মূল্য ছিল ১৭৫.১৩ বিলিয়ন টাকা। নবম সংসদের পিএসি গঠনের পর ২০০৯ সালে ১৫৮টি প্রতিবেদন পিএসিতে জমা দেওয়া হয় যেগুলো তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক সময়ের হওয়ায় সবগুলোই আলোচিত হয়েছে। নবম পিএসি কর্তৃক ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৬৪৮টি প্রতিবেদন গ্রহণ করে। তার মধ্যে ৫৭০টি প্রতিবেদনের আপত্তি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নবম সংসদের পিএসি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবেদন আলোচনা করলেও ৭৮টি প্রতিবেদন অনালোচিত থাকে। এরমধ্যে পূর্বের সংসদের পিএসির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা না করায় ২২৪টি প্রতিবেদন পুরোনো হওয়ায় এই আপত্তিগুলোর সঠিকভাবে সমাধান করা সম্ভব হয়নি। এসব নিরীক্ষা প্রতিবেদন পুরোনো হওয়ায় নবম পিএসি ত্রিপক্ষ সভার মাধ্যমে সমাধান করার সুপারিশ করে। এমনকি নবম পিএসিকে ১৯৮৫ সালের প্রতিবেদন ২০১২ সালে আলোচনা করতে হয়েছে। ফলে এসব নিরীক্ষা আপত্তি পুরোনো হওয়ায় সেগুলো গুরুত্ব হাড়ায়। কারণ এত দিন পরে এসে আর এই আপত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয় কিংবা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সঠিকভাবে উত্তর দেওয়া বা অর্থ পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ফলে ওসিএজির নিরীক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসু হয় না। আর সরকারি কার্যালয়গুলোর দুর্নীতির মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না হওয়ার জন্য এখন পর্যন্ত পিএসি কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে বলেও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

উপসংহারঃ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আইনগত ও নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ব্যহত হচ্ছে। যার প্রভাব পরছে দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায়। সিএজি কার্যালয় সরকারি যেসব আইন-কানুন অনুসরণ করে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার অনেকগুলোই হালনাগাদ নয়। যেমন প্রাদেশিক সরকার ব্যবস্থায় প্রচলিত নিয়মে যাতায়াত ভাতা, দৈনিক ভাতা, বাসা ভাড়া, কন্টিজেন্সি বিল দেওয়া হত সে নিয়মই এখনও দেওয়া হচ্ছে, ২০০৪ সালে রাস্তা তৈরির যে নিয়ম অনুসরণ করা হত এখন সেই নিয়মই অনুসরণ করা হচ্ছে যা বাস্তবসম্মত না হওয়ায় পালন করা সম্ভব হচ্ছে না। পূর্বের নিয়ম মানতে গিয়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ফলে সিএজি কার্যালয় থেকে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হচ্ছে এবং তা নিস্পত্তি হচ্ছে না। আবার নিরীক্ষা আইন ও নিয়োগের বিধিমালা না থাকায় ওসিএজি সংবিধান কর্তৃক প্রদেয় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। অর্থ মন্ত্রণালয় ও জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভর থাকার কারণেও প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করতে পারছে না ওসিএজি। ফলে দক্ষতার সাথে এবং সঠিক সময়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না। আবার দুর্বল মনিটরিং ব্যবস্থা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি, সুযোগ-সুবিধার অভাবে সিএজি কার্যালয়সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়ে পড়েছে। এছাড়া পিএ কমিটির নিরীক্ষা অপত্তির বিষয়ে প্রদেয় সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পালন না করায় ওসিএজির কার্যক্রমের গুরুত্ব হারায়। অর্থাৎ সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব ওসিএজিকে দেওয়া হয়েছে তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

চতুর্থ অধ্যায়
সিএজি কার্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন যথাযথ আইন, নিয়মনীতি, চুক্তি বা অর্থায়নের শর্তাবলীর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ ও যাচাই বাছাই করা করার মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। সরকারি কার্যালয়ের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনো আত্মসাৎ হচ্ছে কিনা তা চিহ্নিত করা সিএজি কার্যালয়ের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। নিরীক্ষার সময়ে সিএজি কার্যালয়ের স্টাফরা সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভাউচার, নথিপত্র, হিসাবের বহি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরীক্ষা করে থাকে। এই নিরীক্ষা কার্যক্রম করতে সিএজি কার্যালয় বিভিন্ন বিভাগ, দপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা-উপজেলা কার্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার করে থাকে। এ অধ্যায়ে সরকারি কার্যালয়গুলো সিএজি কার্যালয় দ্বারা কি ধরনের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে এবং সিএজি কার্যালয়েও কী ধরনের দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

৪.১ নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতি

নিয়োগে দুর্নীতি সিএজি কার্যালয়ের দুর্নীতির একটি বড় চিত্র। এখানে কখনও কখনও সিএজি নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। সংবিধানের ১২৭ নং ধারা অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি সিএজি নিয়োগ দিবেন। কিন্তু ৪৮(৩) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ছাড়া তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন বলে উল্লেখ রয়েছে। ফলে বাংলাদেশে দলগত রাজনীতি প্রচলিত থাকায় এই সব নিয়োগের বিষয়ে কখনও কখনও দলীয় লোকজন নিয়োগ পায়। সিএজি কার্যালয় যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে তা সরাসরি আর্থিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত। নিজস্ব দলের লোক নিয়োগ দিয়ে আর্থিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির ব্যাপারকে ধামাচাপা দেয়ার সহজ ব্যবস্থা করা হয়। সিএজি পদে নিয়োগ পাবার পর সিএজি সাংবিধানিকভাবে তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে, যা কখনও কখনও অপব্যবহার হয়ে থাকে। টিআইবি কর্তৃক অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সিএজির নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়।[৪০]

সিএজি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি অফিসিয়াল বয়োজেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেন। সংবিধানের ধারা ১২৯ (১) অনুসারে একজন সিএজি পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হন। সিএজি নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমানে বয়স নির্ধারিত হয়েছে ৬৫ বছর। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তি নিয়োগ এবং স্বজনপ্রীতির বশবর্তী হয়ে অনেক সময় বয়োজ্যেষ্ঠতার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হয়না। এছাড়াও যেসকল কর্মকর্তারা সিএজি কার্যালয় থেকে বদলি হয়ে সচিবালয়ে চলে আসেন, তাদের মধ্যে কেউ সিএজি হিসেবে নিয়োগ পান।

সিএজি কার্যালয়ে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের নিয়োগ হয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)'র মাধ্যমে। ওসিএজির মাধ্যমে নিরীক্ষক, জুনিয়র নিরীক্ষক, এমএলএসএস ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগগুলোতে মন্ত্রী, এমপি ও পিএসির সদস্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তদবির করার তথ্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি এক নিয়োগে একজনকে নিয়োগের ছয় জন মন্ত্রী, দুই প্রতিমন্ত্রী, একজন সংসদীয় কমিটির সভাপতি ও সরকারি দলের কেন্দ্রিয় নেতার চাপ প্রয়োগের তথ্য পাওয়া যায়। জন্য কোনো কোনো ব্যাচে অসৎ কর্মকর্তার বোর্ড গঠনের মাধ্যমে নিয়োগ হয় এবং ব্যাপক হারে দুর্নীতি হতে দেখা যায়। যেমন ২০১৪ সালে এপ্রিল মাসে সিজিডিএফ এ ২১১ জন নিরীক্ষক, ১৩৬ জন জুনিয়র নিরীক্ষক, ৬২ জন এমএলএসএস ও ৪জন টেলিফোন অপারেটরসহ মোট ৪১৩ জন লোক নিয়োগ করা হয় যেখানে অনেক বড় অংকের অর্থের লেনদেন হয়। জুনিয়র নিরীক্ষক ও নিরীক্ষক হিসেবে যারা নিয়োগ পেয়েছেন তাদের বেশির ভাগকেই ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে। কোনো কোনো নিরীক্ষকের ক্ষেত্রে ১৪ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ প্রদান করতে হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। আবার ২০০৯ সালেও সিজিডিএফে নিরীক্ষক ও জুনিয়র নিরীক্ষক পদে যে নিয়োগ হয়েছিল সে নিয়োগেও জন প্রতি ৩ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়েছে। এছাড়া ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওসিএজির নিয়ন্ত্রণাধীন এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ফিন্যান্স) বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগে বড় ধরনের দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। এখানে জুনিয়র নিরীক্ষক ও নিরীক্ষক পদে প্রায় ৫০০ লোক নিয়োগ করা হয় যার মধ্যে কমপক্ষে ৫০% নিয়োগে জন প্রতি ৩ থেকে ৪

---

[৪০] আমিনুজ্জামান, এম সালাউদ্দীন এবং খায়ের সুমাইয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ, মে ২০১৪, পৃষ্ঠা নং ১৪৫

লক্ষ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়। এই নিয়োগে তৎকালীন রেল মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্লিষ্ট থাকার অভিযোগের তথ্য পাওয়া যায়। এই দুর্নীতির বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি করা হলে তারা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়নি। কারণ তদন্ত প্রতিবেদন ভুলভাবে উপস্থাপন করার জন্য তাদের উপরে চাপ প্রয়োগ করা হয়। আর তাদের পক্ষে মিথ্যা তথ্যসংবলিত প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব নয় বলে তারা প্রতিবেদন জমা দেয়নি। এসব নিয়োগের সময় দুর্নীতি দমন কমিশন থেকেও সুপারিশ করা হয় চাকরি দেওয়ার জন্য। এ ধরনের নিয়োগে বিভিন্ন সময় ডিসিএজি ও মহাপরিচালকরাও দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে। তারা ঘুষ গ্রহণ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিজেদের লোকদের চাকরি দিয়ে থাকে। নিজের লোক নিয়োগের জন্য কোনো কোনো সিএজি পর্যন্ত নিজের লোকদের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় প্রার্থীর খাতায় কোড দিয়ে পরবর্তীতে খাতায় লিখিয়ে চাকরি দেওয়ার মত তথ্যও পাওয়া গেছে।

৪.২ পদায়নে অনিয়ম-দুর্নীতি

এই কার্যালয়ের অধীনস্থ যে সমস্ত অধিদপ্তরের পদায়ন হলে নিরীক্ষা কার্যক্রম করার জন্য অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুযোগ রয়েছে সেই অধিদপ্তরে পদায়নের জন্য উচ্চ মহল থেকে তদবিরের প্রয়োজন হয়। যেমন -বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অধিদপ্তর, মিশন অডিট অধিদপ্তর, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের সুযোগ থাকায় এসব অধিদপ্তরে সকলে পদায়ন পেতে চায়। আবার যেসব প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করলে অবৈধ অর্থ আয়ের সুযোগ বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ প্রদান করা হয়। যেমন - বন্ডেট ওয়ার হাউজ, ডিফেন্স অডিটের ওয়ার্ক সাইড, এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষারত কলেজ ও স্কুল ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। আবার কখনও কখনও পছন্দমতো প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী অ্যাসোসিয়েশনকে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়।

আবার সিএজি কার্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ে বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (ডিএও)'র পদায়ন হয়ে থাকে যারা ওইসব সরকারি কার্যালয়ের বিল যাচাই-বাছাই করে অনুমোদন দিয়ে থাকে। যেমন -জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ইত্যাদি। এসব বিল হিসাবরক্ষণ কার্যালয় কর্তৃক পাশ হওয়ার প্রয়োজন হয় না। এই ডিএও'র পদায়নে প্রায় ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। যেহেতু এ ধরনের সরকারি কার্যালয়গুলোর বিল অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ আয় করতে পারে তাই তারা এই ঘুষ প্রদানে সর্বদা রাজি থাকে।

সিএজি কার্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এখানে কিছু কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী সহজে বদলি হতে চায় না। কারণ তারা প্রত্যেকেই প্রতিটি অধিদপ্তরেই অবৈধ আয়ের একটি পথ তৈরি করে রাখে। এজন্য নিয়ম অনুযায়ী ৩ বছরের পর বদলি করার কথা থাকলেও ঘুষ প্রদান করে কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দিনের পর দিন একই কার্যালয়ে কর্মরত থাকে।

৪.৩ প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে অনিয়ম

প্রশিক্ষণের জন্য যে অতিথি লেকচারার আনা হয় সেই লেকচারার সেলেকশনে স্বজনপ্রীতি হয়ে থাকে। বন্ধু ও ব্যাচমেটদের প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সঠিকভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে সম্মানী নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে যেসব কর্মকর্তার দক্ষতা তৈরি হয়েছে প্রশিক্ষক নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি হওয়ায় তারা প্রশিক্ষক হিসেবে নির্বাচন করা হয় না। উদাহরণ হিসেবে পারপরমেন্স অডিট সম্পর্কে দক্ষতা সম্পন্ন একজন মহাপরিচালকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের প্রশিক্ষক হিসেবে আনা হচ্ছে।

আবার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তাদের উন্নত দেশের বিভিন্ন নিরীক্ষা কার্যালয়ে শিক্ষা সফর, ফেলোশিপ, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের সুযোগও রয়েছে। সিএজি কার্যালয়ের এখতিয়ারে যেসব বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রচলিত আছে সেগুলোর বেশিরভাগই প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে করা হয়না। এই প্রশিক্ষণগুলো মূলত বিক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট কিছু সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের জন্য। প্রকল্পের অর্থে যেসব বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় সেখানে ওসিএজির কর্মকর্তা ছাড়াও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও পাঠানো হয়।

বিদেশে মিশন অডিট ও প্রশিক্ষণে সকল কর্মকর্তাদের সমানভাবে সুযোগ প্রদান করা হয় না। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি অনেক বেশি হয়। কোনো কোনো কর্মকর্তাকে বার বার বিদেশে প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে পাঠানো হয় কোনো কোনো কর্মকর্তা কোনো সুযোগই পায় না। একজন ক্যাডার কর্মকর্তা ৪৭ বার বিদেশী প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটের জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যায়।

এইসব বৃত্তি বা কাজের সুযোগ পাওয়ার কোন সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা নেই। কাজের সাথে সংগতি নেই এমন ব্যক্তিকে কোন প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। আবার কখনও কাজের সংগতি রেখে প্রশিক্ষণে পাঠালেও প্রশিক্ষণ শেষে অর্পিত দায়িত্বের সাথে সংগতি থাকে না। এই সব প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মোন্নতির জন্য খুব একটা সহায়ক হয়না। এছাড়া প্রশিক্ষণের ফলে কতটুকু উন্নতি বা অবনতি হচ্ছে তাও দেখা হয় না। আবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকেই প্রশিক্ষণ শেষে অন্যত্র বদলি হন, ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে দেখা গেছে, পারফরমেন্স অডিটের উপরে প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পরে তাকে সিভিল অডিট অধিদপ্তরে পদায়ন করা হয়েছে। ফলে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান তারা কাজে রাগাতে পারে না।

পূর্বে নন ক্যাডারদের বিদেশী প্রশিক্ষণ ও মিশন অডিটে পাঠানো হলেও ২০১২ সালের পরে কোনো নন ক্যাডার কর্মকর্তাকে বিদেশী প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়নি। পূর্বে নন ক্যাডারদের বিদেশে প্রশিক্ষণে পাঠালেও তার সংখ্যা ছিল অনেক কম। ২০১২ সালে বিদেশে প্রেরণকৃত কর্মকর্তাদের উপর ভিত্তি করে দেখা যাচ্ছে মোট ৭৮ জনের মধ্যে ৬৪ জন ক্যাডার কর্মকর্তা এবং ১৪ জন্য নন ক্যাডার প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ও সুপারিন্টেডেন্ট।[৪১]

আবার মিশন অডিট গুলোতে মহাপরিচালকসহ অন্যান্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের পাঠানো হয় যার ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হয়ে থাকে। বিদেশে যেসব কার্যালয়ে নিরীক্ষা করানো হয় সেগুলো সাধারণত শাখা কার্যালয় হয়ে থাকে। এই শাখা কার্যালয়ের নিরীক্ষা করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রেরণ করা হয় যা সাশ্রয় নয়। অথচ বাংলাদেশের প্রধান কার্যালয়ের নিরীক্ষা করার দায়িত্ব থাকে নন ক্যাডার কর্মকর্তা ও নিরীক্ষকদের উপর।

৪.৪ দায়িত্বে অবহেলা

মহাপরিচালক পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়া

মহাপরিচালকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য সিএজি কার্যালয় থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। প্রতি বছর মহাপরিচালকরা কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা সম্পন্ন করবে, কতটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করবে, কতজন লোক নিরীক্ষা কাজের জন্য নিয়োজিত থাকবে, কত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন সম্পন্ন করবে ইত্যাদি কাজের জন্য সিএজির কোনো বার্ষিক পরিকল্পনা নেই। এমনকি সিএজি থেকে কোনো নির্দেশনাও নেই যে মহাপরিচালক থেকে কতটি প্রতিবেদন তারা চায়। মহাপরিচালকদের কার্যক্রম সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা, মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরি করছে কিনা, না করলে কেন করছে না ইত্যাদি বিষয়ে মহাপরিচালকদের কোনো জবাবদিহি করতে হয় না। পূর্বে মহাপরিচালকদের কার্যক্রমের জন্য তাদের সাথে সভা করা হত এমন কি কখনও কখনও ব্যক্তি পর্যায়ে সভা করা হত। কিন্তু বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষে ৯০ দিনের মধ্যে নিরীক্ষা প্রতিবেদন সিএজি কার্যালয়ে জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও কোনো মহাপরিচালক বছরের পর বছর ধরে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা না দিলেও তার জন্য তাকে কোনো জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। গবেষণায় দেখা গেছে কোনো কোনো মহাপরিচালক দুই বছর বা দীর্ঘ সময় ধরে কোনো নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা না দিলেও তাকে কোনো জবাবদিহিতায় আনা হচ্ছে না। এমনও অনেক মহাপরিচালক রয়েছে যারা কোনো প্রতিবেদনই তৈরি করে না। ২০১১-১২ অর্থ বছরের নিরীক্ষা ২০১২-১৩ সালের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এসেও কতটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন সম্পন্ন হয়েছে তার কোনো জবাবদিহিতা মহাপরিচালকদের নিকট থেকে নেওয়া হয় না। মহাপরিচালকদের জবাবদিহিতায় এ ধরনের ঘাটতি থাকায় তার প্রভাব নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পড়ে। আবার মহাপরিচালকরাই যখন দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে তখন তাদের পক্ষে নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

মাঠ পর্যায়ের কাজে মনিটরিং না করা

পূর্বে অডিট অধিদপ্তর দ্বারা মাঠ পর্যায়ে যে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হত সেগুলো সঠিক ভাবে করা হচ্ছে কিনা তার জন্য লটারির মাধ্যমে সিএজি কার্যালয় থেকে কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ে পাঠানো হত মনিটরিং করার জন্য। যেমন কোনো নিরীক্ষা টিম যখন মাঠে নিরীক্ষা করতে যেত তাদের কার্যক্রম দেখার জন্য অন্য একটি টিম পাঠানো হত। আবার নিরীক্ষা টিমের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শেষে

[৪১] সিএজি ওয়েবসাইট http://www.cagbd.org থেকে সংগৃহীত তথ্য

অডিট অধিদপ্তরগুলোতে নিরীক্ষার যে খসড়া প্রতিবেদন জমা দিত তা যাচাই-বাছাই করে কিছু নিরীক্ষার বিষয়ে পুন যাচাই করার জন্য মাঠ পর্যায়ে আরো একটি টিম পাঠানো হত। কিন্তু বর্তমানে এই মনিটরিং করানোর পদ্ধতিটি সম্পূর্ণই বন্ধ রয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায় থেকে নিরীক্ষা টিম যতটুকু তথ্য নিয়ে আসে তার বাইরের কোনো তথ্য সিএজি কার্যালয়ে পাওয়া যায় না। নিরীক্ষা টিম যদি ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি উত্থাপন থেকে বিরত থাকে তাহলে সিএজি কার্যালয়ের কিছুই করার থাকে না। আবার নিরীক্ষা টিম যদি অন্যায়ভাবেও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে তাও যাচাই-বাছাই করার কোনো পদ্ধতি এখানে নাই। ফলে সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ওসিএজিকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সঠিকভাবে পালিত হয় না। অন্যদিকে সিএজি কার্যালয় থেকে যখন মনিটরিং করার জন্য কোনো টিমকে মাঠে পাঠাত তখন তাদের বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বে অবহেলার তথ্য পাওয়া যায়। এসব কর্মকর্তারা সঠিকভাবে মনিটরিং করত না, মনিটরিং করার নামে ঘুরে বেড়াত, কেনাকাটা করত ইত্যাদি। ফলে যে উদ্দেশ্যে তাদের পাঠানো হত তা ব্যহত হত এবং উল্টো তাদের পাঠানোর জন্য যে ব্যয় হত তা সাশ্রয় হত না।

মাঠ পর্যায়ের দুর্নীতির জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া

সিএজি কার্যালয়ের স্টাফরা মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্নরকম হয়রানির আশ্রয় নিলেও তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে না। সিএজি কার্যালয়ের বেশির ভাগ কর্মকর্তা এ বিষয়টি জানলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয় না। উপ-পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা তার নিয়ন্ত্রণে কর্মকরত মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘অডিট আপত্তি সব বিক্রি করে দিয়ে আসবেন না, কিছু অন্তত নিয়ে আসবেন।’ তিনি বোঝাতে চেয়েছে নিরীক্ষা করে যেসব অনিয়ম দেখবে তার সবগুলো যেন ঘুষের বিনিময়ে নিরীক্ষা প্রতিবেদনে থেকে বাদ না দেওয়া হয়, কিছু আপত্তি যেন অন্তত উল্লেখ করা হয়।

বক্স ২: ঘুষ নিয়ে ধরা পড়লে শাস্তির ব্যবস্থা না করা

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তরের একজন নিরীক্ষক ২৪ লক্ষ টাকাসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই নিরীক্ষকের দুর্নীতি সম্পর্কে একজন উপ পরিচালক কে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সকল ধরনের তথ্য সংবলিত করে একটি প্রতিবেদন প্রদান করলে মহাপরিচালক তা ছুড়ে ফেলে দেয় এবং তাকে এই প্রতিবেদন সংশোধন করতে বলে যাতে দুর্নীতির চিত্র সঠিকভাবে না আসে। সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষক মহাপরিচালককে বড় অংকের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে প্রতিবেদন তার পক্ষে আনার চেষ্টা করে।

সরকারি কার্যালয়গুলো বিভিন্ন সময় মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের হয়রানির বিষয়ে জানালেও প্রয়োজনীয় প্রমানের অভাবে এসব নিরীক্ষকদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। ফলে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতি করার প্রতি উৎসাহ বোধ করে। অন্যদিকে এসব হয়রানির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চাইলেও উল্টো তাদের হয়রানির শিকার হতে হয়। শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া এত দীর্ঘ যে কোনো না কোনো ভাবে তারা আইনের ফাঁক দিয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। এখন পর্যন্ত দুর্নীতির কারণে কারো চাকরি চলে গেছে বা বদলি করা হয়েছে এমন তথ্য ওসিএজিতে পাওয়া যায়নি। আবার কল্যাণ সমিতির প্রভাবের কারণেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান বজায় না রাখা

মাঠ পর্যায়ের যে ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি নিরীক্ষা টিম কর্তৃক উদ্ঘাটিত হয় সেগুলো নিরীক্ষা টিম প্রতিবেদন আকারে অধিদপ্তরগুলোর উপ পরিচালক বরাবর পেশ করে থাকে। উপ পরিচালক যাচাই-বাছাই করার পরে মহা পরিচালকও তা যাচাই-বাছাই করার নিয়ম রয়েছে। পরবর্তীতে এ্যাডভান্স প্যারা ও জেনারেল প্যারার জন্য আপত্তিসমূহ পুন যাচাই-বাছাই করে সিএজি কার্যালয়ের প্রতিবেদন শাখায় পাঠিয়ে দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবেদনগুলো উপ পরিচালকসহ মহাপরিচালকরা সঠিকভাবে যাচাই-বাছাই না করেই প্রতিবেদন শাখায় পাঠিয়ে দেয়। এমনও উদাহরণ রয়েছে যে মহপরিচালকের নিকট সিএজি কার্যালয়ের প্রতিবেদন শাখা থেকে কোনো কোনো প্রতিবেদন ৫ বার ফেরত পাঠানো হয়েছে পুনঃ যাচাই করার জন্য। আবার প্রতিবেদন শাখা থেকেও এই প্রতিবেদন সঠিক সময়ে যাচাই-বাছাই করা হয় না। কখনও কখনও এই প্রতিবেদন খুলেও দেখা হয় না বলেও অভিযোগ রয়েছে। এভাবে প্রতিবেদনগুলো যখন যাচাই-বাছাই না করে প্রতিবেদন আকারে চলে যায় তখন অনেক অগুরুত্বপূর্ণ আপত্তি প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয়। এমনকি কখনও কখনও আপত্তিগুলো এতটাই অস্পষ্ট থাকে যে পিএ কমিটি যখন এগুলো নিয়ে আলোচনা করে সেগুলো তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় না।

সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আপত্তির সঠিক জবাব পাঠালেও নিস্পত্তি না করা

আবার সিএজি কার্যালয় যেসব আপত্তি উত্থাপন করে সে সব আপত্তির জন্য ব্যাখ্যা চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে চিঠি দেওয়া হয়। এসব কার্যালয় থেকে সঠিক সময়ে আপত্তি নিস্পত্তির জন্য উত্তর পাঠালেও তা নিস্পত্তি করা হয় না। দিনের পর দিন ধরে তা ফেলে রাখা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তির জবাব দিলেও তা মহাপরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে পর্যন্ত জানানো হয় না। এ ধরনের আপত্তি নিস্পত্তি না করার জন্য সর্বোচ্চ ৪ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়া যায়। একই ভাবে নিরীক্ষা টিম কর্তৃক যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয় সেগুলো স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট না হওয়ায় নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও উত্তর প্রদান করা সম্ভব হয় না।

ম্যানুয়ালের প্রয়োগিক সমস্যা

সিএজি কার্যালয় যে ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয় তা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রকল্পের দ্বারা হালনাগাদ করা হয়। ফলে নিয়মের দিক থেকে এসব ম্যানুয়ালের তেমন কোনো সীমাবদ্ধতা না থাকলেও নিরীক্ষা করার জন্য ম্যানুয়ালগুলোতে যে ধরনের কাঠামো ও পরিকল্পনার কথা উল্লেখ রয়েছে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময়ে সেগুলো সঠিকভাবে পালন করা হয় না। যেমন পরিকল্পনার সময়ে নিরীক্ষা কাজের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয় তা মানা হয় না, সম্পূর্ণ নথিপত্র যাচাই-বাছাই না করে প্রতিবেদন প্রদান করা এবং গুনগত মান বজায় না রাখা এবং প্রতিবেদন দিতেও দেরি করে থাকে।

ন্যায়-নীতি বিধিমালার প্রয়োগ না থাকা

ন্যায়-নীতি বিধিমালা শুধু কাগজে কলমেই রয়েছে। এটি কখনও লজ্ঘন হচ্ছে কিনা বা লজ্ঘন হলেও কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে কখনও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

৪.৫ মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষাকালীন অনিয়ম-দুর্নীতি

সিএজি কার্যালয়ের সবচেয়ে বড় দুর্নীতির খাত হচ্ছে নিরীক্ষাকালীন নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ঘুষ গ্রহণ ও তাদের হয়রানি। প্রতিটি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষা টিম দ্বারা হয়রানির ধরন প্রায় প্রতিটি কার্যালয়েই একই রকম। যেসব সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তাদের প্রতিটি কার্যালয়কেই নিরীক্ষা টিমকে ঘুষ বা উপঢৌকন, যাতায়াত খরচ ও খাবার খরচ প্রদান করতে হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষকদের থাকারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের সংখ্যা বেশি এবং অর্থ ব্যয়ের সুযোগ বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অধিক পরিমাণ ঘুষ আদায় করা হয়। অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের উপরে আপত্তির সংখ্যা বেশি দেওয়া যায় ও আপত্তির ধরন বেশি যৌক্তিক ও জোড়ালো হয় সেগুলোর নিকট থেকে ঘুষের পরিমাণও বেশি আদায় করা হয়। সুতরাং ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে জোরালো আপত্তি, বাজেটের পরিমাণ এবং প্রকল্প ব্যয়ের উপরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেন হয় থোক বরাদ্দে। ছোট বাজেট সম্পন্ন কার্যালয়গুলোতে ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি না হলেও নিরীক্ষা শেষে নিরীক্ষা টিমকে কমপক্ষে ১০ হাজার টাকা ঘুষ প্রদানের তথ্য পাওয়া যায়। আর বড় বাজেট ও প্রকল্পসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়।

গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি বাদ দিয়ে অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন

ঘুষ আদায়ের সুযোগ তৈরি করার জন্য কার্যালয় গুলোতে আপত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যখন ঘুষ আদায় হয় তখন এই আপত্তির ধরনগুলো পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে জোড়ালো ও অধিক পরিমাণ আর্থিক দুর্নীতির উপরে উত্থাপিত আপত্তিগুলো বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিগুলোই চূড়ান্ত হিসেবে নেওয়া হয়। এসব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের গ্রহণযোগ্য যুক্তি প্রদান করতে সমস্যা হয় না। ফলে পরবর্তীতে দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোতে এসব আপত্তি সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অন্যদিকে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিগুলো বাদ পড়ে যাওয়ার কারণে সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি বা অর্থ আত্মসাৎ হয় সেগুলোর জন্য জবাবদিহি করার আর সুযোগ থাকে না। যেমন স্থানীয় সরকার খাতের একটি প্রতিষ্ঠানের উপরে তৈরিকৃত একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আপত্তিগুলো ছিল -প্রাপ্ত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না হওয়া, আয়কর বাবদ কম টাকা আদায় করা, ঠিকাদারের বিল থেকে মূল্য সংযোজন কর আদায় না করা, রোড রোলারের ভাড়া আদায় না করা, শিডিউলের জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত না করা, অনুমোদন ছাড়া বার্ষিক কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত কার্য সম্পাদন, অনিয়মিত ব্যয়, চেক জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ প্রভৃতি। এর মধ্যে বেশিরভাগ আপত্তির সাথেই তৃতীয় কোনো পার্টি জড়িত, সংশ্লিষ্ট কার্যালয় সড়াসরি কম জড়িত।

বক্স ৩: গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন

একটি সরকারি হাসপাতালের স্টোর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সরকার থেকে যে পরিমাণ ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছে তা তাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি এবং আপত্তিতে তা উল্লেখ করা হয়। হাসপাতালটি সহজেই আপত্তির জবাব দিয়েছে যে, যেহেতু ওষুধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও ওষুধ সরবরাহ করেছে, এর জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোনোভাবেই দায়ী নয়। এভাবে আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়ে যায়। অথচ এই হাসপাতাল প্রতি বছর অবৈধভাবে গাড়ি ব্যবহার বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করে। নিরীক্ষা টিম ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে এই অবৈধ গাড়ি ব্যবহারের বিষয়ে কোনো আপত্তি উত্থাপন করে না।

একই আপত্তি বার বার উত্থাপণের মাধ্যমে হয়রানি

একই আপত্তি বার বার উত্থাপণ করে নিরীক্ষা টিম কর্তৃক হয়রানি করার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। এমনকি প্রিঅডিটের মাধ্যমে পাশকৃত বিলের উপরে পোস্ট নিরীক্ষকদের আপত্তি দিয়ে হয়রানি করা হয়।

ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির তুলনায় অনিয়মের উপরে বেশি আপত্তি উত্থাপন করা হয়। যেসব আপত্তি সহজে উত্তর দিয়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব কিংবা সরকারের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে সেগুলো বেশি গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়।

বক্স ৪: একই আপত্তি বার বার উত্থাপন

একটি সরকারি কার্যালয় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হয়ে যাওয়ার পরে তাদের বেতন কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে কোম্পানির বেতন কাঠামো কার্যকর করা হয়েছে। এই কোম্পানিটির বেতন কাঠামো তাদের পরিচালনা বোর্ড দ্বারা অনুমোদনকৃত। কিন্তু সিএজি কার্যালয় থেকে এই বেতন কাঠামোর উপরে প্রতি বছর গিয়ে আপত্তি উত্থাপন করে। এই আপত্তির জবাবে তারাও প্রতি বছর একই ধরনের কাগজপত্র জমা দেয়। কিন্তু আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয় না। কিংবা এই আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য কোনো দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় সভাও ডাকা হয় না।

ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি ও সমঝোতার কারণে নিরীক্ষায় দুর্নীতির সঠিক চিত্র না দেওয়া

সাধারণত বড় বাজেট ও প্রকল্প সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে নিরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি করা হয়। এক পর্যায়ে ঘুষের পরিমাণ নির্ধারিত হলে নিরীক্ষা টিমের সাথে একটি মৌখিক সমঝোতা হয়ে যায়। একটি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিরীক্ষা টিমের ভাষ্য ছিল এরকম, 'অডিট করাবেন না করবেন'। অর্থাৎ যদি নিরীক্ষা করানো হয় তাহলে নিরীক্ষা টিম তাদের ইচ্ছামত অধিক পরিমাণ আপত্তি উত্থাপন করে চলে যাবে। আর যদি নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করে তাহলে নিরীক্ষা টিমকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইচ্ছামত আপত্তি রেখে বাকিগুলো মুছে দিতে বলবে। সমঝোতার মাধ্যমে যখন নিরীক্ষা করানো হয় তখন, নিরীক্ষা টিমকে যেভাবেই ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ নিরীক্ষা টিম নিরীক্ষা করার পরে যেসব আপত্তি উত্থাপণ করা হয় সেসব আপত্তির তালিকা নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয় এবং নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানকে বাছাই করতে বলা হয় কোন আপত্তিগুলো তারা রাখবে এবং কোনগুলো বাদ দিবে। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের ইচ্চামত আপত্তির তালিকা নিয়ে নিরীক্ষা টিম অডিট অধিদপ্তরে জমা দেয়।

কখনও নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা টিমের সাথে সমঝোতায় না আসলে নিরীক্ষা টিম উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ফাইলের উপরে আপত্তি দিতে চায়। তখন বাধ্য হয়েই নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সমঝোতা করে থাকে। সমঝোতায় না আসলে নিরীক্ষা টিম প্রথমে গিয়েই ৩০ থেকে ৪০টি আপত্তি উত্থাপণ করে ফেলে। এর পরে শুরু হয় ঘুষ নিয়ে দর কষাকষি। ঘুষের পরিমাণ নির্ধারণ হওয়ার পরে এই

আপত্তির সংখ্যা নেমে ৫ থেকে ১০টিতে চলে আসে। এই আপত্তিগুলো তখন খুব বড় অংকের দুর্নীতির না হয়ে ছোট ছোট দুর্নীতি কিংবা অনিয়মের হয়ে থাকে। এসব আপত্তির জবাব পর্যন্ত নিরীক্ষা টিম ঠিক করে দেয় বা লিখে দেয়।

স্থানীয় পর্যায়ে অডিটি প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে নিরীক্ষা করা

স্থানীয় পর্যায়ে নিরীক্ষা করতে গেলে ঘুষ প্রদানের সাথে সাথে পরিবারের সদস্যদের জন্য শপিং করে দেওয়া এবং দর্শনীয় এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। কখনও কখনও নিরীক্ষা টিম অডিটি প্রতিষ্ঠানে না গিয়ে হোটেলে বা সার্কিট হাইজে বসে নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করে। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান তাদের সমস্ত কাগজপত্র হোটেলে কিংবা নিরীক্ষা টিমের থাকার স্থানে নিয়ে আসে এবং নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়ে চলে যায়। আবার নিরীক্ষা টিমের আপত্তি উত্থাপণ করার পরে প্রাথমিক পর্যয়ে যখন নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সাথে শেয়ার করা হয় তখন অনেক আপত্তিরই যৌক্তিক ব্যাখ্যা সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয় না।

৪.৬ মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষার পরবর্তী সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি

নিরীক্ষা টিম কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানকে চিঠির মাধ্যমে আপত্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং আপত্তির জবাব দিতে বলা হয়। এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয় দ্বিপক্ষীয় সভায়[৪২]। কিন্তু এসময়ে কিছু আপত্তির ব্যাখ্যা যৌক্তিক হলেও ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে আপত্তি নিস্পত্তি না করে হয়রানি করা হয়। কখনও কখনও সবগুলো আপত্তি দ্বিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন না করে ফেলে রাখা হয় দিনের পর দিন।

বক্স ৫: ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে হয়রানি

সিস্টেম লসের মূল বিষয়টি নির্ভর করে এলাকার উপর। যেমন- ধানমণ্ডির তুলনায় পোস্তগোলায় সিস্টেম লস বেশি। কারণ এই সকল এলাকায় রাস্তাঘাট খারাপ থাকে, মাস্তানদের প্রভাব বেশি থাকে, এছাড়াও তার চুরি, সার্কিট ব্রেকার চুরি, ট্রান্সফরমার চুরি- এই সবই সিস্টেম লসের সাথে যুক্ত। কিন্তু সকল এলাকার সিস্টেম লসের পরিমাণ যদি একই হারে ধরা হয় তবে তা বাস্তব সম্মত নয়। কিন্তু সিএজি কার্যালয় একই হার ধরে সিস্টেম লসের উপরে প্রতি বছরই আপত্তি দিচ্ছে। পদ্ধতি পরিবর্তন ব্যতিত এই সিস্টেম লস সংশোধনের আর উপায় নেই বা সত্যিই যদি কোন দুর্নীতি হয়ে থাকে তা নির্ধারণের উপায় নেই। প্রতি বছরই এই আপত্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি হচ্ছে না।

আবার দ্বিপক্ষীয় সভায় যে আপত্তিগুলো নিস্পন্ন না হয় সেগুলো ত্রিপক্ষীয়[৪৩] সভায় আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই সভাতেও কখনও কখনও সবগুলো আপত্তি উত্থাপন করা হয় না। আপত্তির বিষয়ে সমাধান হলেও এই সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় না। ব্যাখ্যা যৌক্তিক হলেও গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফেলে রাখে। এই ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোর জন্য হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে যাতায়াত খরচ, খাবার খরচ ছাড়াও ৪-৫ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।

আবার ত্রিপক্ষীয় সভাগুলোতে আপত্তি নিস্পত্তির জন্য একজন এজি কর্মকর্তা, মন্ত্রণালয় থেকে একজন ডেপুটি সেক্রেটারি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে একজন কর্মকর্তা থাকেন। আপত্তি নিস্পত্তির জন্য প্রতিষ্ঠান যে অঞ্চলে বা এলাকায় সেখানেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই আয়োজনের সকল ব্যয়, যাতায়াত, থাকা- খাওয়া ও এজি কর্মকর্তাকে ঘুষ প্রদান বাবদ সকল খরচ বহন করে ওই প্রতিষ্ঠান। এই ক্ষেত্রে অডিটি প্রতিষ্ঠানের ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকার মত ব্যয় হয়। সাধারণত প্রত্যেক মাসেই তাদের এমন ২-৩ টি মিটিং থাকে। এর ফলে আপত্তি নিস্পত্তি হয়ে যায় ঠিকই কিন্তু সরকারের টাকা আদায় হয় না।

মাঠ পর্যায়ের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভার পরে নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি বা নিয়ম-বহির্ভূত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায়ের সবশেষ স্তর হচ্ছে পিএ কমিটির সভা। কোনো কোনো নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তির ক্ষেত্রে পিএ কমিটির উপ কমিটির সদস্যদেরকেও ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। কখনও কখনও এই উপ কমিটি আপত্তি নিস্পত্তি করলেও ওসিএজি থেকে তা মানা হয়নি। কারণ ওসিএজির যৌক্তিক আপত্তিকে এই উপ কমিটি অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে যখন নিস্পত্তি করে দিয়েছে তখন সিএজির পক্ষ থেকে তা মানা হয়নি।

সিএজি কার্যালয় কর্তৃক আরো একটি দুর্নীতির পথ হচ্ছে পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তি নিস্পত্তি করা। এই নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিস্পত্তির জন্য দ্বিপক্ষীয় সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই সভা কখনও কখনও ঢাকার বাইরে কোনো পর্যটন এলাকার ভাল হোটেলে অনুষ্ঠিত

[৪২] সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও সিএজি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভা
[৪৩] সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান, মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সভা

হয়। নিরীক্ষকদের সকল ব্যয় বহন করাসহ ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি প্রায় ১৫ বছরের নিরীক্ষা আপত্তি একসাথে নিষ্পত্তি করা হয়। এসব ক্ষেত্রে ঘুষ লেনদেনের পরিমাণও আপত্তির ধরন বা অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রার উপর নির্ভর করে। তবে কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা দিতে হয় প্রতি নিরীক্ষা টিমকে।

৪.৭ অডিট অধিদপ্তর অনুযায়ী দুর্নীতির চিত্র

৪.৭.১ সিভিল অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সিভিল অডিট অধিদপ্তর সিজিএর নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাবরক্ষণ কার্যালয়গুলো নিরীক্ষা করে থাকে। অর্থাৎ প্রধান হিসাবরক্ষণ কার্যালয়, বিভাগীয় হিসাব রক্ষণ কার্যালয়, জেলা-উপজেলা পর্যায়ের হিসাব রক্ষণ কার্যালয়গুলো এই অধিদপ্তর দ্বারা নিরীক্ষা করা হয়। এই বিভাগের ঘুষের পরিমাণ নির্ভর করে পাশকৃত বিলের পরিমাণ ও বিলে অর্থের পরিমাণের উপরে। যে হিসাব রক্ষণ কার্যালয়ের টাইমে স্কেল, ফিক্সেশন, বোনাস ও বেতন বিলের সংখ্যা এবং প্রকল্প বা উন্নয়ন বাজেটের সংখ্যা বেশি সেই হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের নিকট থেকে বেশি ঘুষ আদায় করা হয়। যেমন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ও দূর্যোগ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ যেসব মন্ত্রণালয়ের আর্থিক ব্যয় বেশি সেসব মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ লেনদেনও বেশি হয়। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়গুলোতে প্রথমেই গিয়ে ঘুষের পরিমাণ নিয়ে সমঝোতা করে। কখনও থোক বরাদ্দে কখনও স্টাফ প্রতি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারণ করে তা উত্তোলন করে দেওয়া হয়। সাধারণত প্রতি বছর টিম প্রতি ২০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায় করা হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়।

আবার জেলা উপজেলা পর্যায়ের হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের ক্ষেত্রে এই নিরীক্ষার জন্য ভিন্নভাবে ঘুষ গ্রহণ করা হয়। হিসাবরক্ষণ কার্যালয়গুলো নিরীক্ষার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ের চেয়ারম্যানদের নিকট থেকে অর্থ আদায় করে নিরীক্ষকদের ঘুষ প্রদান করে থাকে। সাধারণতঃ প্রতি চেয়ারম্যানের নিকট থেকে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা করে আদায় করে নিরীক্ষকদের দেওয়া হয়। একইভাবে সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন শিক্ষা কার্যালয়, কৃষি কার্যালয় সহ অন্যান্য কার্যালয় থেকেও অর্থ আদায় করে নিরীক্ষা টিমকে ঘুষ হিসেবে প্রদান করা হয়। সাধারণত এ ধরনের কার্যালয় থেকে প্রতি নিরীক্ষা টিমের জন্য ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা আদায় করে থাকে।

৪.৭.২ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ওসিএজির অধিদপ্তরগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর। সরকারের সকল ধরনের ভবন নির্মান ও মেরমতকারী প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করে থাকে এই অধিদপ্তর। যেহেতু পূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রচুর প্রকল্প পরিচালিত হয় এবং বড় বড় আকারের অর্থ ব্যয় হয় সেহেতু এই মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করার জন্য ঘুষ লেনদেনও হয় অনেক বেশি। সাধারণত এই অধিদপ্তর থেকে যেসব নিরীক্ষা টিম নিরীক্ষা করে থাকে তারা প্রতি নিরীক্ষা কাজের জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ গ্রহণ করে থাকে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে এই ঘুষের পরিমাণ বেশিও হয়ে থাকে। প্রধান কার্যালয় নিরীক্ষা করার জন্য যে পরিমাণ ঘুষ লেনদেন হয় শাখা কার্যালয়গুলো নিরীক্ষা করার জন্য তার তুলনায় কম ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। তবে যাতায়াতের জন্য যদি নিরীক্ষা টিমের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে প্রতিদিন প্রতিজনকে ৫০০ টাকা করে যাতায়াত খরচও দিতে হয়।

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের মহপরিচালকেরর একটি আলাদা ক্ষমতা রয়েছে। এই মহাপরিচালকের বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার পদায়ন দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে। এই বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা যেসব কার্যালয়গুলোতে পদায়ন হয় সেসব কার্যালয়গুলো থেকে প্রিঅডিটের মাধ্যমে বিল অনুমোদনের জন্য বিলের ১% থেকে ২% টাকা পর্যন্ত ঘুষ আদায় করে থাকে।

৪.৭.৩ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

এই অধিদপ্তর, সরকারের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নিরীক্ষা পরিচালনা করে। ক্ষেত্রগুলো হলো: (ক) বিভিন্ন ধরনের সরকারি কার্যালয় যেমন, মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইত্যাদি, (খ) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ; এবং (গ) সরকারি রাজস্ব নিরীক্ষা বিশেষ করে কর রাজস্বসমূহ যেমন, আয়কর, শুল্ক, আবগারি, মূল্য সংযোজন কর এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব যেমন, নিবন্ধন ফি এবং এ ধরনের অন্যান্য ফি। এ অধিদপ্তর বাৎসরিক নিরীক্ষার জন্য যে পরিকল্পনা করে তার জন্য সাধারণত প্রতিটি দল প্রতিষ্ঠান প্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়ে থাকে। এছাড়া এই অধিদপ্তর কর্তৃক আরো অন্য অনেকগুলো নিরীক্ষা করানো হয় যেগুলো পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে না। যেমন কিছু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এমপিওভুক্ত হওয়ার জন্য অনেক সরকারের নিরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই নিরীক্ষা কার্যক্রমগুলো স্থানীয় ও রাজস্ব অধিদপ্তর সম্পন্ন করে থাকে। এসব স্কুল, কলেজগুলো নিজেদের প্রয়োজনে এই অধিদপ্তরে তাদের প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করানোর জন্য আবেদন পাঠায়। যেহেতু এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনের উপরে নির্ভর করে এসব প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি করা হয় সেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান থেকে ঘুষের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রায় ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে এই অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও পরিচালককে নিরীক্ষা টিমগুলোর ঘুষ প্রদান করতে হয়। সাধারণত তাদেরকে প্রতি নিরীক্ষা টিম কর্তৃক মাসিক ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা হিসেবে ঘুষ প্রদান করতে হয়।

> **বক্স ৬: সরকারের ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঘুষ প্রদান**
>
> বাংলাদেশে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা সুতা আমদানি করে থাকে। তাদের এই আমদানির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সরকার তাদের ক্যাশ ইনসেনটিভ প্রদান করে থাকে। সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান এই ক্যাশ ইনসেনটিভের পরিমাণটি ঘোষণা করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে যখন নিরীক্ষা করা হয় তখন প্রায় ২০ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে।

৪.৭.৪ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ সহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের বাজেট এবং আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ঘুষের পরিমাণ। সাধারণতঃ বাজেট এক কোটি টাকা হলে নিরীক্ষা টিমকে কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

৪.৭.৫ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরের (ফাপাড) অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিরীক্ষা কাজের জন্য ফাপাড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবচেয়ে বেশি ঘুষ আদায়ের সুযোগ রয়েছে। কারণ এখানে সম্পূর্ণই প্রকল্প নিরীক্ষা করা হয়। আর প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ঘুরে এই তথ্যটি ছিল সাধারণ যে যেখানে প্রকল্প ব্যয় যত বেশি ঘুষ লেনদেনের পরিমাণও তত বেশি। এই অধিদপ্তরের প্রতি নিরীক্ষা টিম প্রতি বারে নিরীক্ষা বাবদ হেড কার্যালয় বা মূল প্রকল্প কার্যালয়ের নিকট থেকে সবনিম্ন ৫০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ পর্যন্ত ঘুষ নিয়ে থাকে। আর শাখা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে এই ঘুষের পরিমাণ সর্বনিম্ন একই রকম-৫০ হাজার টাকা। তবে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ ছাড়াও প্রতিজনকে যাতায়াত বাবদ গাড়ির ব্যবস্থা করা ও গাড়ির ব্যবস্থা না করতে পারলে ৫০০ টাকা করে যাতায়াত খরচ দিতে হয়।

৪.৭.৬ প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সশস্ত্র বাহিনীর সকল ইউনিট ও ফরমেশন, আন্তঃবাহিনী সংগঠনসমূহ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের কার্যালয়সমূহ নিরীক্ষা করার দায়িত্ব এই অধিদপ্তরের। এই অধিদপ্তরের নিরীক্ষা করার জন্য দুই ধরনের বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জন করেছে নিরীক্ষকরা। একটি গ্রুপ এই প্রতিরক্ষা বিভাগের পূর্ত সংক্রান্ত কাজের নিরীক্ষা করে এবং অন্য গ্রুপ রেশন খাতের নিরীক্ষা করে থাকে। এই দুই খাতের জন্য ঘুষ লেনদেনের মাত্রায়ও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এই খাতের সংশ্লিষ্ট পূর্ত সংক্রান্ত কাজের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে টিম প্রতি ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে। আর এই খাতের রেশন সংক্রান্ত নিরীক্ষার ক্ষেত্রে টিম প্রতি ১ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এ অধিদপ্তরের নিরীক্ষক এক ধরনের বিশেষায়িত দক্ষতা অর্জন করায় তারা এখানে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করছে। এই নিরীক্ষকদের প্রতিরক্ষা বিভাগের ন্যায় রেশন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

৪.৭.৭ ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তরের দুর্নীতি

এই অধিদপ্তর ডাক, তার ও দুরালাপনি বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করে থাকে। পূর্বে এই অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি থাকায় এখানে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ বেশি ছিল। ফলে নিরীক্ষা কাজের জন্যও ঘুষ লেনদেনের পরিমাণও বেশি ছিল। বর্তমানে ডাক ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করায় সরকারি ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। ডাক বিভাগের ইউনিট ও কার্যালয় ভেদে নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে।

আর টেলিযোগাযোগ বিভাগের প্রধান কার্যালয় ও শাখা কার্যালয়ভেদেও নিরীক্ষার জন্য ঘুষ লেনদেনের পরিমানে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন প্রকল্প ব্যয়গুলো প্রধান কার্যালয় কর্তৃক হয় বলে এখানে ঘুষ লেনদেনের পরিমাণও বেশি। সাধারণত টেলিযোগাযোগ বিভাগের নিরীক্ষার জন্য কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়। তবে প্রকল্পের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়ে থাকে।

৪.৭.৮ পারফরমেন্স অডিট অধিদপ্তরের অনিয়ম ও দুর্নীতি

সাধারণত পারফরমেন্স অডিটের ক্ষেত্রে আর্থিক অনিয়ম-দুর্নীতির তুলনায় নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কতটুকু তার কার্যক্রমে সফলতা অর্জন করতে পারছে সে বিষয় সম্পর্কে বেশি উল্লেখ করা হয়। এখানে যেহেতু দুর্নীতির জন্য আপত্তি খুব জোড়ালো হয় না তাই এখানে ঘুষের পরিমাণও কম। কারণ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জানে এ ধরনের নিরীক্ষার মাধ্যমে যে আপত্তি দেওয়া হবে তার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের খুব বেশি ক্ষতি হবে না। তাই নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোও খুব একটা ঘুষ প্রদান করতে চায় না।

৪.৮ সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ লেনদেনের সার্বিক চিত্র

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে দেখা যাচ্ছে সিএজি কার্যালয়ে নিম্নলিখিত খাত বা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিতে হয়।

সারণি ৪.১: সিএজি কার্যালয়ের ঘুষ নেওয়ার সার্বিক চিত্র

ক্রমিক নম্বর	ঘুষ প্রদানের খাত		সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/সংশ্লিষ্ট কাজের খাত	ঘুষের পরিমাণ (টাকায়)
১	নিয়োগে দুর্নীতি (নিরীক্ষক, অধস্তন নিরীক্ষক ও ড্রাইভার নিয়োগ)		উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (সিজিডিএফ)	৩,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (এডিজি ফিন্যান্স-রেলওয়ে)	৩,০০,০০০-৪,০০,০০০
২	পছন্দমত প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করার সুযোগ		সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা	৫০,০০০-১,০০,০০০
			অ্যাসোসিয়েশন	১০,০০০-২০,০০০
৩	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে (বাৎসরিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বাৎসরিক নিরীক্ষার বাইরের নিরীক্ষা)	৪,০০,০০০-৫,০০,০০০
			উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (মাসিক)	১০,০০০-২০,০০০
৪	পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)		বিভাগীয় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১% - ২% (বিলের)
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (বাৎসরিক নিরীক্ষা)	৫০,০০০-১,০০,০০০
৫	সিভিল অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)	সিএও	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
		জেলা ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক	৫,০০০-১০,০০০
			সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- সরকারি কার্যালয় কর্তৃক	৩০,০০০-৪০,০০০

৬	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য (টিম প্রতি)	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- প্রধান কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-৫,০০,০০০
		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- শাখা কার্যালয় কর্তৃক	৫০,০০০-২,০০,০০০
৭	বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী (প্রতি কোটিতে)	৫,০০,০০০
৮	প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী- পূর্ত সংক্রান্ত কাজের জন্য	৫০,০০০-১,০০,০০০
		সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী-রেশন খাতে	১,০০,০০০-১,৫০,০০০
৯	ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০-১,০০,০০০
১০	ত্রিপক্ষীয় সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	৪,০০০-৫,০০০
১১	দীর্ঘ দিনের পুরোনো আপত্তি নিষ্পত্তিতে	সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা কর্মকর্তা-কর্মচারী	২০,০০০(কমপক্ষে)

উপসংহার

নিরীক্ষা টিমকে ঘুষ দেওয়ার বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা টিমকে দেওয়ার জন্য ঘুষ যোগান দিয়ে থাকে। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিরীক্ষা টিমকে ঘুষ প্রদান করার বিষয়টিতে এমনই অভ্যস্ত হয়ে পরেছে যে তারা এখন আর এটাকে ঘুষ বলতেও চায় না। কেউ কেউ একে সার্ভিস চার্জ হিসেবে উল্লেখ করে। অন্যদিকে নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের দুর্নীতি ঢাকার জন্যই তাদেরকে ঘুষ প্রদান করে থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্বের গবেষণার সাথে তুলনামূলক চিত্র

টিআইবি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ২০০২ সালে তখনকার ওসিএজির ওপরে একটি গবেষণা কাজ সম্পন্ন করে। উক্ত গবেষণায় সিএজি কার্যালয়ের বিভিন্ন আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা উঠে আসে। উক্ত গবেষণার প্রেক্ষিতে বর্তমান সিএজি কার্যালয়ের সমস্যা এবং কার্যক্রমে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এই অধ্যায়ে তাই উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে পূর্বের গবেষণার সাথে বর্তমান গবেষণার তথ্যের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপণ করা হলো।

সারণি ৫.১: ২০০২ সালের গবেষণা প্রতিবেদনের সাথে বর্তমান গবেষণার তুলনা

ক্রম	নির্দেশক	২০০২ সাল	২০১৪ সাল
১	নিরীক্ষা আইন	কোনো নিরীক্ষা আইন ছিলনা	খসড়া নিরীক্ষা আইন করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়েছে
২	ম্যানুয়াল	সিভিল অডিট ম্যানুয়াল, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট ম্যানুয়াল ও পারফরমেন্স অডিট ম্যানুয়াল	পূর্বের ম্যানুয়ালসহ তথ্য প্রযুক্তি নীতি, মিডিয়া হ্যান্ডবুক, যোগাযোগ কৌশল
৩	সিএজি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগদান পদ্ধতি	সিএজি সাংবিধানিকভাবে নিয়োগ পান	একই রকম রয়েছে
		বিসিএস কর্মকর্তাগণ পিএসসির পরীক্ষার মাধ্যমে সংস্থাপণ মন্ত্রণালয় নিয়োগ দেয়। অর্থ বিভাগ এই ক্যাডার নিয়ন্ত্রণ করে	একই রকম রয়েছে
		বাজেট স্বল্পতার কারণে প্রয়োজনীয় বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতে না পারা	একই রকম রয়েছে
৪	পদায়ন ও বদলি	ওসিএজি র মাধ্যমে করা হত	একই রকম রয়েছে
৫	অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীলতা	-বাজেট, নিয়োগ, নিয়ম-নীতিসহ সকল বিষয়ে নির্ভরশীল হওয়ায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে বাধার সৃষ্টি	একই রকম রয়েছে
৬	সিএজির কার্যকাল	৫ বছর বা সিএজির বয়স ৬০ বছর যেটি আগে হবে। ফলে সিএজি ১/২/৩ বছরের বেশি কাজ করার সুযোগ পেত না	৫ বছর বা সিএজির বয়স ৬৫ বছর যেটি আগে হবে। ফলে সিএজি প্রায় ৫ বছর কাজ করার সুযোগ পায়
৭	নিরীক্ষা কার্যক্রমের ধরন	৩ ধরনের নিরীক্ষা করা হত -১. আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, ২. নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরীক্ষা ও ৩. পারফরমেন্স নিরীক্ষা।	একই ধরনের নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পূর্বের ৩ ধরনের নিরীক্ষা যেমন -১. আর্থিক নিরীক্ষা, ২. নিয়মানুগত্য ও বৈধতা নিরীক্ষা, ৩. পারফরমেন্স নিরীক্ষার সাথে ও ইনফরমেশন অডিট বা তথ্য নিরীক্ষা যুক্ত করা হয়েছে
৮	নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় (অটোমেশন) পদ্ধতির প্রয়োগ	কোনো রকম স্বয়ক্রিয় প্রক্রিয়া ছিল না	বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু করার জন্য নিরীক্ষা টিম গুলোকে ল্যাপটপ প্রদান করা এবং অনলাইনে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান শুরু

৯	নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অবস্থা	বেশির ভাগ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সরকারের কাজের সাফল্য সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য থাকত না	পারফরমেন্স অডিটের ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য উল্লেখ করা হলেও পূর্বের ন্যায় হুবহু একই ফরমেটে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তবে প্রতিবেদনের মান উন্নয়নের জন্য পাইলট নিরীক্ষা প্রতিবেদন নামক একটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে
১০	প্রশিক্ষণ	উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, প্রশিক্ষণ কাজে লাগানো যেত না	-ফিমাতে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন - প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি
		প্রশিক্ষণের সিলেবাস সময়োপযোগী নয়	- ফিমার সিলেবাস একই রকম রয়েছে
		প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না	বর্তমানে প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে হাতে কলমে না শেখানো ও স্বল্প সময় ধরে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় বলে কোনো কোনে ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যাচ্ছে না
		বিদেশী প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে না পারা	বিদেশী প্রশিক্ষণ নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট পদে পদায়ন না করার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগানো যাচ্ছে না
১১	পিএসির পারফরমেন্স	ব্যাপক সংখ্যক ব্যাকলগ প্রতিবেদন আলোচনার অপেক্ষায় ছিল	নবম পিএসি কর্তৃক ব্যাপক সংখ্যক প্রতিবেদন আলোচিত হওয়ায় ব্যাকলগ প্রতিবেদনের পরিমাণ কমে আসে
		পিএসি কর্তৃক কখনও হিসাবের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা হত না	এখন হলেও খুবই স্বল্প পরিসরে
১২	প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যাকলগ আপিত্তির সংখ্যা	প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ব্যাপক সংখ্যক নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির অপেক্ষায় ছিল	বর্তমানেও একই রকম রয়েছে। পূর্বের ব্যাকলগ আপত্তির সাথে বর্তমানের নিরীক্ষা আপত্তিও যোগ হয়ে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে
১৩	প্রতিবেদন জনসমক্ষে জানানো	কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় না	একটি মিডিয়া সেল গঠন করা হলেও দীর্ঘ দিন কোনো প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় নি। সম্প্রতি ২৪ নভেম্বর প্রথম বারের মত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওসিএজির প্রতিবেদন জনসম্মূখে প্রকাশ করা হয়
		ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন আপলোড করা হত না	ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন আপলোড করা হয় তবে সর্বশেষ প্রতিবেদন থাকে না। সর্বশেষ পেশকৃত প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত অংশ ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়

১৪	নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা	মাঠ পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং করা হত	বর্তমানে একেবারেই করা হয় না
১৫	নিরীক্ষার আপত্তি পর্যালোচনা করা	গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম পুনরায় পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করা হত যার সংখ্যা খুব কম ছিল	বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম পুনরায় পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ প্রায় হয় না বললেই চলে। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা যাচ্ছে না
১৬	বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পরা	বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পরত	বর্তমানেও বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পরছে
১৭	নিরীক্ষায় অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া	নিরীক্ষায় অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হত	বর্তমানেও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু অগুরুত্বপূর্ণ বা সরকারের সিদ্ধান্তের উপরে নির্ভর করে এমন বিষয়গুলোর উপরে আপত্তি বেশি উত্তাপণ

উপরের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ওসিএজিতে অনেক ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলো একই রকম রয়েছে। ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ড্রাফট নিরীক্ষা আইন তৈরি, তথ্য প্রযুক্তি নীতি, মিডিয়া হ্যান্ডবুক, যোগাযোগ কৌশল তৈরি, সিএজির মেয়াদকালের ক্ষেত্রে সিএজির বয়স ৬০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৬৫ বছর করা, নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ার প্রচলন শুরু এবং বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় কাজ করার জন্য নতুন নতুন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া, পিএসির নিরীক্ষা প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করার কারণে ব্যাকলগ প্রতিবেদনের সংখ্য কমে আসা, ওসিএজির নিরীক্ষা প্রতিবেদন জনসম্মুক্ষে আনার জন্য প্রথম বারের মতো প্রেস বিজ্ঞপ্তির দেওয়া ও ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন আপলোড করা ও মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন সেল গঠন করা।

অন্যদিকে যেসব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো একইরকম রয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, সিএজির নিয়োগ, স্টাফদের পদায়ন ও বদলি, অর্থ ও জনপ্রশাসনের উপরে ওসিএজির নির্ভরশীলতা, নিরীক্ষার ধরণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের কাঠামো ও তথ্য উপস্থাপণ, ফিমা কর্তৃক প্রশিক্ষণ, নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আপত্তির অবস্থা এবং ওসিএজির কর্মকর্তাদের অনিয়ম দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্তার বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ওসিএজির কার্যক্রমে নেতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এসব পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে নিরীক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং পূর্বের তুলনায় কমে যাওয়, নিরীক্ষা প্রতিবেদনের গুণগত মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে পর্যালোচনা না করা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন আপত্তির সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিভিন্ন দেশের সরকারি নিরীক্ষা কার্যালয়ের তুলনামূলক চিত্র

দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে নিরীক্ষা কার্যক্রম কতটা দক্ষতার সাথে পালন করা হচ্ছে তার উপরে। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে নিরীক্ষা কার্যক্রমে ইতিমধ্যে বহু পরিবর্তনের মাধ্যমে অনেক উন্নত আর্থিক ব্যবস্থাপনা করছে। এসব দেশে দুর্নীতির মাত্রাও অনেক কম। পূবের্র অধ্যায়গুলোতে বাংলাদেশের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও একটি কার্যকর নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য বা ক্ষমতা কি হওয়া প্রয়োজন কিংবা কিভাবে একটি সফল নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান তার কার্যক্রম সম্পন্ন করে তা জানা প্রয়োজন। আর সে জন্যই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা এবং একটি আদর্শ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি আদর্শ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বের সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্থ দেশগুলোর নিরীক্ষা পদ্ধতি ও সে কার্যালয়ের কাঠামো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে যার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা বা গ্যাপগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। একইভাবে যেহেতু উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পার্থক্য রয়েছে সেহেতু এসব দেশের নিরীক্ষার সকল অংশ বাংলাদেশে প্রয়োগ করা সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য উপমাহাদেশের সম পরিস্থিতিসম্পন্ন কিছু দেশের অভিজ্ঞতাও এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা হচ্ছে। উন্নত দেশের মধ্যে সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং উপমহাদেশের মধ্যে ভারত ও শ্রীলংকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

৬.১ একটি আদর্শ নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

বিশ্ব ব্যাংকসহ বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে একটি কার্যকর নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কিছু আবশ্যক বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি। সালভাটর সিআভো- ক্যাম্পো ও হ্যাজেল এম. ম্যাকফারসন তাদের পাবলিক ম্যানেজমেন্ট ইন গ্লোবাল পারস্পেকটিভ গ্রন্থে, সুপ্রীম অডিট ইনস্টিটিউটের কার্যকরতা বিষয়ে উল্লেখ করে। তাদের মতে এই প্রতিষ্ঠান তখনই সফলতার সাথে কাজ করতে সক্ষম হয় যখন এই প্রতিষ্ঠান-

১. সরকারের এক্সিকিউটিভ শাখা হিসেবে আইনগতভাবে স্বাধীন হতে হবে
২. এই প্রতিষ্ঠান সরকারের আইন সভার নিকট প্রতিবেদন করবে যা সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হবে
৩. এই প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তিতে কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না
৪. নিজের বাজেটের উপরে এই প্রতিষ্ঠানের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে
৫. জনবলের ব্যবস্থাপনার বিষয়সহ সকল দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠার সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত হবে এবং
৬. এই প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সক্ষমতা, দক্ষতা এবং পেশাদারিত্বসম্পন্ন হবে

উপরের বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের ওসিএজির ক্ষেত্রে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত এবং যেগুলো রয়েছে সেগুলোও পুরোপুরি কার্যকর নয়। বাংলাদেশের সংবিধানে সিএজিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া হলেও নিজেদের বাজেটের উপরে সিএজি কার্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। ওসিএজির প্রতিবেদন সরকারের আইন সভার নিকট পেশ করা হলেও তা এখনও পুরোপুরি সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়। ওসিএজির প্রতিবেদন সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য তেমন কোনো প্রচারণা ওসিএজিতে দেখা যায়নি। তবে সম্প্রতি প্রতিবেদন জনসম্মুক্ষে জানানোর জন্য একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। কিছু প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে দেওয়া থাকলেও তা অনেক পুরোনো, সর্বশেষে ২০০৮ সালে প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তবে সকল অধিদপ্তরের প্রতিবেদনগুলো ওয়েবসাইটে নেই। গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির কোনো তথ্য সাধারণ জনগণকে জানানোর কোনো উদ্যোগ ওসিএজির নাই। আবার জনবলের ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও ওসিএজি সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত নয়। এর জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভর করতে হয়। নিরীক্ষা করার জন্য ওসিএজির যে সক্ষমতা প্রয়োজন তা ওসিএজির কর্মকর্তা-

কর্মচারীদের অনেক ক্ষেত্রেই নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী বাণিজ্যিক, কম্পিউটার, চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে পাশকৃত জনবলে নিয়োগ ওসিএজির পক্ষে সম্ভব হয় না।

৬.২ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও বৈশিষ্ট্য

বিশ্বের বিভিন্ন কম দুর্নীতিগ্রস্থ দেশের নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত অনুকরণীয় দৃষ্টান্তগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো যেগুলো বাংলাদেশে প্রয়োগের মাধ্যমে এ দেশের নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব।

সুইডেন[৪৪]

সুইডেনের 'ন্যাশনাল অডিট অফিস (এনএও)' এ দেশের সরকারের সকল এক্সিকিউটিভ ক্ষমতাকে নিরীক্ষা করে। এটি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যারা সংসদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। এই কার্যালয়ের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে তিন জন 'অডিটর জেনারেল' কাজ করে। এই তিন জন অডিটর জেনারেল মিলেই নিরীক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা করে থাকে। এই কার্যালয় পারফরমেন্স নিরীক্ষা ও আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা দুটিই করে থাকে। কোন প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা করা হবে, কিভাবে করা হবে, কাকে দিয়ে করা হবে ইত্যাদি বিষয় অডিটর জেনারেলের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। অডিটর জেনারেলের অভিজ্ঞতা এবং যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এই নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই কার্যালয় কিভাবে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করবে তার জন্য অ্যাক্ট রয়েছে এবং এই অ্যাক্টে এনএও ও প্রদেশের কার্যক্রম সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এনএও নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য কোনো লিমিটেড কোম্পানি বা ফাউন্ডেশনকে নিয়োগ দিতে পারে।[৪৫] এনএও তার নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী ও লিমিটেড কোম্পানি উভয়ের মাধ্যমেই নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তবে মনিটরিং করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এনএওর হাতে থাকে। আইনে এনএওর জন্য যে নির্দেশনা রয়েছে তাতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য শাস্তির ব্যাবস্থা রয়েছে এবং তাদের ভাল কাজের জন্য প্রণোদনারও ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই প্রণোদনা নির্ধারণ করে এনএওর সদস্যগণ। এনএও কার্যালয় তাদের নিরীক্ষা আপত্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে মত বিনিময়, সেমিনার, বিতর্কের আয়োজন করে এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য প্রেস বিজ্ঞপ্তির আয়োজন করে থাকে। এছাড়াও এই কার্যালয় বিভিন্ন সরকারি কার্যালয়ের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ কৌশলকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে থাকে।[৪৬] সুইডেনে হিসাব এবং নিরীক্ষা বিভাগ পৃথক ভাবে কাজ করে এবং সম্পূর্ণ স্বয়ক্রিয়।

অস্ট্রেলিয়া[৪৭]

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল অডিট অফিস (এএনএও) হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সরকার এবং পার্লামেন্টের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কার্যালয়ের প্রধান হচ্ছে অডিটর জেনারেল (এজি)। অডিটর জেনারেল অ্যাক্ট, ১৯৯৭ এর আওতায় অডিটর জেনারেলের কাজ এবং ক্ষমতা প্রদত্ত ও নির্ধারিত রয়েছে। অডিটর জেনারেল সরাসরি স্পীকারের মাধ্যমে পার্লামেন্টে প্রতিবেদন পেশ করে। অডিটর জেনারেল দশ বছরের জন্য পিএসি এর সুপারিশে গভর্নর- জেনারেলের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়। এটি একটি সাংবিধানিক পদ। এখানে হিসাব এবং নিরীক্ষা বিভাগ পৃথক ভাবে কাজ করে এবং সম্পূর্ণ স্বয়ক্রিয়।

অস্ট্রেলিয়ার এজি কার্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য সুবিধাদি সম্বলিত একটি সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা আছে। এই নির্দেশনার মাধ্যমে এজি খুব সহজেই বেতন, পুরস্কার, পারফর্মেন্স ভিত্তিক পুরস্কার এবং পদোন্নতি সকল বিষয় পরিচালনা করে থাকে। এখানে নিরীক্ষা কার্যালয়ের দক্ষ কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পুরস্কৃত করার পদ্ধতি রয়েছে। পারফর্মেন্স এর উপর ভিত্তি করে প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এবং যে কর্মকর্তা-কর্মচারী বাণিজ্যিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখে তাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণত গণ যোগাযোগ, বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্রাহক ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা

[৪৪] বিস্তারিত জানতে দেখুন http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16043/Granskningsplan, ২৯ আগস্ট ২০১৪
[৪৫] অ্যাক্ট অন অডিট অফ স্টেট একটিভিটিস ইটিসি. (২০০২:১০২২), http://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/, ৩১ আগস্ট ২০১৪
[৪৬] অ্যাক্ট কনটেইনিং ইনস্ট্রাকশনস ফর দি সুইডিস ন্যাশনাল অডিট অফিস (২০০২:১০২৩), http://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/, ৩১ আগস্ট ২০১৪
[৪৭] বিস্তারিত জানতে দেখুন *www.**anao**.gov.au*

ব্যবস্থাপনা এবং নতুন গবেষণা বা আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য কিছু পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে - অডিটর জেনারেল অ্যানুয়াল এ্যাওয়ার্ড ফর আউট স্ট্যান্ডিং অ্যাচিভমেন্ট, ন্যাশনাল অডিট অস্ট্রেলিয়া ডে কাউন্সিল মেডালিস্, অডিটর জেনারেল সার্টিফিকেট ফর এপ্রেসিয়েশন। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎে কোন ব্যক্তিগণ এএনএও এর নেতৃত্ব দিবে তা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া এজি সরকারি নিরীক্ষা যথার্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য বেসরকারি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ দিয়ে থাকে।

অস্ট্রেলিয়ান এজি কার্যালয়ের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের পরিকল্পনা পদ্ধতি। এটি একটি যৌথ পরিকল্পনা[৪৮] পদ্ধতি এবং বছরে তিন বার এটি পর্যালোচনা করা হয়। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে লক্ষ্য ও কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং এগুলো সরাসরি এএনএও কার্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এই কার্যালয় বার্ষিক বাণিজ্য পরিকল্পনা করে যা যৌথ বাণিজ্য পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত। এছাড়াও বার্ষিক একটা বাজেট পরিকল্পনাও করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে সহজে এবং যথার্থভাবে পরিকল্পনা যাচাই করা যায়। বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি ব্যাল্যান্স স্কোরকার্ড দেয়া হয়, যা বাণিজ্য পরিকল্পনা এবং বাজেট কতটুকু লক্ষ্য পূরণে সফল তা প্রকাশ করে।

আমেরিকা[৪৯]

আমেরিকার সরকারের সর্বোচ্চ নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে ইউএস গভমেন্ট একাউন্টাবিলিটি অফিস (জিএও)। এর প্রধান হচ্ছে কম্পট্রোলার জেনারেল (সিজি)। এটি একটি সাংবিধানিক পদ। সিজি ১৫ বছরের জন্য প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে নিযুক্ত হয়। তবে এই নিয়োগ প্রেসিডেন্ট সিনেটরদের মতামত নিয়ে দিয়ে থাকে। এই কার্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের সকল অর্থ প্রাপ্তি এবং ব্যয় সংক্রান্ত বিষয় নিরীক্ষা করা এবং তা যাচাই বাছাইয়ের পরে প্রতিবেদন তৈরি করে তা প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে সিনেটে পেশ করা। এ কার্যালয় দুই ধরনের নিরীক্ষা করে থাকে। যথা - আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফর্মেন্স নিরীক্ষা। এ নিরীক্ষার প্রায় কার্যক্রম জিএওর নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কাজগুলো জিএও'র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্পন্ন করে থাকে এবং প্রতিবেদন তৈরি হয়ে গেলে তা সিজির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। সিজি সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিয়োগ, পদোন্নতি, শাস্তিসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। বিশেষ ধরনের নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সিজি নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বহিরাগত দক্ষ লোক নিয়োগ করতে পারে। এ কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানের শাখা হিসেবে জিএও কৌশলগত পরিকল্পনা, পারফরমেন্স পরিকল্পনা এবং এক্সিকিউটিভ এজেন্সির নিকট জবাবদিহি করার জন্য বার্ষিক পারফরমেন্স এবং জবাবদিহিতা প্রতিবেদন তৈরি করে। এই পরিকল্পনা কৌশল তাদের লক্ষ্যের সাথে সম্পর্কিত রেখে করা হয়। জিএও একটি সংখ্যাগত নির্দেশকের মাধ্যমে তাদের নিজেদের পারফরমেন্স যাচাই-বাছাই করে থাকে যেখানে তাদের কাজের অর্জন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সাধারণ জনগণ এবং অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয় । জিএওর কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হচ্ছে কিনা তা প্রতি তিন বছর পর পর পিয়ার রিভিউর মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করা হয়। এই পিয়ার রিভিউ নিরীক্ষা নথিপত্র, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার এবং কাজের ধরন ও আওতা যাচাইয়ের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। পিয়ার রিভিউর প্রতিবেদন নির্বাহী কমিটি, উর্ধ্বতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

ভারত[৫০]

ভারতের সরকারি নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে তার নাম হচ্ছে 'অফিস অফ দা কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল' এবং সিএজি হচ্ছে এই কার্যালয়ের প্রধান। এটি একটি সাংবিধানিক পদ। ওসিএজি সরকারি অর্থায়নে চালিত প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা করে থাকে এবং প্রতিবেদন প্রদান করে। ১৯৭১ সালে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলস (ডিউটিস, পাওয়ারস এ্যান্ড কন্ডিসন্স অফ সার্ভিসেস) অ্যাক্ট পাশের মাধ্যমে সিএজি সংবিধানে প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সিএজি কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদনগুলো সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (পিএসি) দ্বারা সংসদে পেশ করা হয়। সিএজি রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

---

[৪৮] যৌথ পরিকল্পনা বলতে এএনএও ও সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়কে বোঝানো হয়েছে

[৪৯] বিস্তারিত জানার জন্য জিএওর ওয়েবসাইট http://www.gao.gov/legal/redbook/redbook.html দেখুন

[৫০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ওয়েবসাইট *www.sai**india**.gov.in*

ওসিএজি সকল ইউনিয়ন এবং প্রাদেশিক সরকারের সরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অবাণিজ্যিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিরীক্ষা সম্পন্ন করে থাকে। মূলত: ৩ ধরনের নিরীক্ষা করে থাকে- ১। আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ২। নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা (কমপ্লায়েন্স অডিট) ও ৩। পারফর্মেন্স নিরীক্ষা। এখানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আলাদা আলাদা হিসাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে এবং সেই অনুযায়ী নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়ে থাকে। নিরীক্ষা পদ্ধতি আংশিক স্বয়ক্রিয় করা হয়েছে। তবে কোনো কোনো প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বয়ক্রিয় করা হয়েছে।

এই কার্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে নিরীক্ষা বোর্ডের একটি নির্দিষ্ট নিরীক্ষা সংবিধান রয়েছে। এই সংবিধান অনুসারে সরকারি খাতের সকল প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা করা হয়। এই নিরীক্ষা বোর্ড গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে। তারা তাদের নিরীক্ষা ফলাফল নিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বা সচিবালয়ের সাথে আলোচনা করে। এই আলোচনা মূলত নিরীক্ষা সম্পর্কে তাদের মতামত জানার জন্য করা হয়ে থাকে। এই আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে ওসিএজি তার মূল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।

সিএজি কার্যালয় নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীর পাশাপাশি বহিরাগত নিরীক্ষক নিয়োজিত করতে পারে। এখানে ভাল পারফরমেন্সের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্রদান করা হয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে। একইভাবে খারাপ পারফরমেন্স বা অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য শাস্তিরও ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে ভারতীয় ওসিএজি তার নিরীক্ষা ও সামগ্রিক পরিচালনা পদ্ধতিতে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে। কিছু বিষয়ে ওসিএজি'র ভূমিকা প্রশংসনীয়। যেমন- ২জি স্পেকট্রাম এলোকেশন (2G Spectrum Allocation), কোল মাইন এলোকেশন (Cole Mine Allocation), ফুডার এসকেম (Fooder Scam) বিষয়ে নিরীক্ষা আপত্তি উত্থাপিত হলে সেগুলো নিয়ে সংসদে আলোচিত হয় এবং এর জন্য যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

শ্রীলংকা[৫১]

শ্রীলংকার সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে তার নাম হচ্ছে 'দি অডিটর জেনারেলস ডিপার্টমেন্ট -শ্রীলঙ্কা'। এই কার্যালয় ও এর পরিচালনা পদ্ধতি মূলত ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশ ও ভারতের ন্যায় এই কার্যালয়ও সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন। অডিটর জেনারেল হচ্ছে এই কার্যালয়ের প্রধান। সাংবিধানিক কাউন্সিলের সুপারিশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট অডিটর জেনারেলকে নিয়োগ প্রদান করে। এই কার্যালয়ের সকল স্টাফদের নিয়োগ করার ক্ষমতাও অডিটর জেনারেলের রয়েছে। সম্প্রতি এজি কার্যালয় কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানের নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা চলছে। শ্রীলংকার হিসাব এবং নিরীক্ষা বিভাগকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশন অন ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করে। এ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক হিসাব ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত মানদণ্ড গ্রহণ করার পরামর্শ দেয়। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালে একাউন্টিং এবং অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট (১৫) তৈরি হয়। এই অ্যাক্টের মাধ্যমে কিছু এন্টারপ্রাইজকে **'স্পেসিফাইড বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস (এসবিই)'** হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং এসবিই আর্থিক বিবরণী তৈরি, উপস্থাপন এবং নিরীক্ষা পরিচালনা করে। একই সাথে এই অ্যাক্ট শ্রীলংকা একাউন্টিং এন্ড অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস মনিটরিং বোর্ড (এসএলএএএসএমবি) প্রতিষ্ঠা করে। শ্রীলংকার হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনাকারী আইনগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগতভাবে অনেকটা সরকারের হস্তক্ষেপ এবং এজির নিজস্ব নিয়ন্ত্রণের মিশ্র প্রতিফলন।

এজির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ সংযোজন, যা শ্রীলংকার সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে। শ্রীলংকার সংবিধানের ধারা ১৫৪(২) অনুসারে, অর্থমন্ত্রী অডিটর জেনারেলের সম্মতিতে পাবলিক কর্পোরেশন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ দেন। এছাড়াও ধারা ১৫৪(৪) অনুসারে, অডিটর জেনারেল যেকোনো দক্ষ লোককে নিরীক্ষক পদে নিয়োগ দিতে পারেন। ব্যক্তিগত নিরীক্ষক এবং নিরীক্ষা ফার্ম উভয়ই তাদের কাজ যথার্থভাবে পালন করার জন্য অডিটর জেনারেলের

[৫১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ওয়েবসাইট *www.**auditorgeneral**.gov.lk/web*

নিকট দায়ী। শ্রীলংকার এজি কার্যালয় সমসাময়িক অন্যান্য দেশের সিএজি কার্যালয়ের তুলনায় অনেক ভালো কাজ করছে। এর পিছনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। যেমন- এখানে ক্যাডার কর্মকর্তাগণ মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা কাজের সাথে সরাসরি নিযুক্ত থাকে। এর ফলে কাজের মানোন্নয়ন করা সম্ভব। এছাড়া এখানে ব্যক্তি মালিকানাধীন নিরীক্ষা ফার্মের মাধ্যমে বেশ কিছু নিরীক্ষা করা হয় বলে কাজের চাপ কম পড়ে এবং সঠিক উপায়ে কাজ করা সম্ভব হয়।

শ্রীলংকার এজি কার্যালয়ে স্টাফদের কাজে বিভিন্ন উপায়ে উৎসাহিত করা হয়। কখনো আর্থিক পুরষ্কার আবার কখনো অন্য কোন পুরস্কারের মাধ্যমে তাদের কাজে উৎসাহিত করা হয়। এজি শ্রীলংকার বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের একটি অত্যন্ত অনুকরণীয় বিষয় রয়েছে। এই কার্যালয় তার কমকর্তা-কর্মচারীদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদান এবং প্রতিবেদন প্রচার ও নিরীক্ষার মানের উপর ভিত্তি করে সম্মানিত করে। ২০০৬ সালে, এজি শ্রীলংকার এই খাতে প্রায় ২৫% পর্যন্ত বাজেট বাড়ানো হয়। তবে এই বাজেট সাধারণ যে বাজেট করা হয় তার থেকে আলাদা খাতে করা হয়।

শ্রীলংকা এজি কার্যালয়ের আরো একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে গবেষণা এবং উন্নয়নের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিভাগ রয়েছে এবং এই বিভাগটি একজন ডেপুটি অডিটর জেনারেলের মাধ্যমে পরিচালিত। এই বিভাগটি গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বিষয়, নিরীক্ষার প্রভাব, সরকারি খাতের বিভিন্ন পকল্প, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে।

৬.৩ বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য দেশের তুলনামূলক চিত্র

উপরের আলোচনা এবং বাংলাদেশের ওসিএজি বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখ্য প্রতিটি দেশেই নিরীক্ষা আইন রয়েছে যার মাধ্যমে নিরীক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে নিরীক্ষা আইন এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে এবং বাংলাদেশ শুধু নিরীক্ষা কার্যক্রম ছাড়া অন্যান্য ক্ষমতা যেমন প্রয়োজন অনুসারে নিয়োগ, পদায়ন ও বদলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সংবিধানে দেওয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছে না। উন্নত দেশগুলোর প্রতিটিতেই শুধু আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশসহ ভারত ও শ্রীলংকায় নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা, আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা করা হয়। তবে বাংলাদেশে পারফরমেন্স নিরীক্ষা খুব সীমিত আকারেই করা হয়।

সারণি ৬.১: বিশ্বে বিভিন্ন দেশের নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক চিত্র

দেশের নাম	নিরীক্ষা আইন দ্বারা স্বাধীনভাবে ক্ষমতার ব্যবহার	নিরীক্ষার ধরন	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা
সুইডেন	নিরীক্ষা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো হয়
অস্ট্রেলিয়া	নিরীক্ষা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো হয়
আমেরিকা	নিরীক্ষা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো হয়

ভারত	নিরীক্ষা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, কমপলায়েন্স ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে	আংশিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো হয়
শ্রীলঙ্কা	নিরীক্ষা আইনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে না	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, কমপলায়েন্স ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয়	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে	আংশিক স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো হয়
বাংলাদেশ	নিরীক্ষা আইন নাই এবং স্বাধীনভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে না	আর্থিক বিবরণী নিরীক্ষা, কমপলায়েন্স ও পারফরমেন্স নিরীক্ষা	বেসরকারি নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করানো হয় না	পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা নাই	স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিরীক্ষা করানো শুরু হয়েছে

আবার সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ভারত ও শ্রীলংকায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা করতে পারলেও বাংলাদেশ তা করতে পারছে না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই স্টাফদের ভাল পারফরমেন্সর জন্য প্রণোদনা এবং অনিয়ম-দুর্নীতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও বাংলাদেশে তা একদমই প্রয়োগ করতে দেখা যায় না। প্রতিটি রাষ্ট্রেই স্বয়ক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষা করানো হলেও ভারত, শ্রীলংকা ও বাংলাদেশে এখনও পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়নি।

উপসংহার

উপরের উল্লিখিত রাষ্ট্রের ভাল অভিজ্ঞতাসমূহ বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে হলে প্রথমেই অপেক্ষমান নিরীক্ষা আইনের অনুমোদন প্রয়োজন। যত তাড়াতাড়ি এই নিরীক্ষা আইন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে তত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের নিরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা সম্ভব ও নিরীক্ষা টিমকে আরো শক্তিশালী করা সম্ভব, সর্বোপরি সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত করার কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশ

দুর্নীতি প্রতিরোধ, জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সিএজি কার্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। একমাত্র সিএজি কার্যালয়ের মাধ্যমেই জনপ্রশাসনের অর্থ সরকারি নিয়ম মেনে ব্যয় হচ্ছে কি না তা যাচাই-বাছাই করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে সিএজি কার্যালয় বিভিন্ন রকম প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে দায়িত্ব পালন করার কারণে প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে না। একইভাবে সিএজি কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যথাযথ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে না পারায় তারা বিভিন্ন রকম অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পরছে। সর্বোপরি ওসিএজির উপরে সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হচ্ছে। নিম্নে সিএজি কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত সীমাবদ্ধতার চিত্র এবং এর ফলাফল ও প্রভাবের একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারিণি ৭.১: সিএজি কার্যালয়ের সমস্যার ধরন, ফলাফল ও প্রভাবের সার্বিক চিত্র

সমস্যার ধরন ⇨	সমস্যার ফলাফল ⇨	সমস্যার প্রভাব
* নিরীক্ষা আইন না থাকা ও হালনাগাদ আইনের অভাব * মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভরশীলতা * প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি * সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি * জবাবদিহিতার ঘাটতি * তত্ত্বাবধানে সমস্যা * পিএসির সকল প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনা না করা * সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের জবাব না দেওয়া	▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রতি আগ্রহ হারানো ▪ নিরীক্ষার মান বজায় না থাকা ▪ আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া ▪ প্রতিবেদন তৈরিতে দেরি হওয়া ▪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়া ▪ সরকারি কার্যালয়ের দুর্নীতির সঠিক চিত্র উঠে না আসা ▪ হয়রানি বৃদ্ধি পাওয়া ▪ সরকারি অর্থ আত্মসাৎ হওয়া ও রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়	▪ নিরীক্ষা কাজের গুরুত্ব হাড়ানো ▪ নিয়ম-বহির্ভূত ব্যয়কৃত ও আত্মসাৎকৃত অর্থ আদায় না হওয়া ▪ সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত না হওয়া ▪ দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিরীক্ষা আইনের অনুপস্থিতি ও হালনাগাদ আইনের অভাব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপরে নির্ভরশীল থাকা, প্রয়োজনীয় ও দক্ষ লোকবলের ঘাটতি, জনবলের সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি ও জবাবদিহিতা ঘাটতি, কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে সমস্যার ফলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রতি অনিহা তৈরি হচ্ছে, কাজের মান বজায় থাকছে না ও সময় মাফিক কাজ সম্পাদন হচ্ছে না। পাশাপাশি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ছে, সরকারি কার্যালয়গুলোর অনিয়ম-দুর্নীতির সঠিক চিত্র উঠে আসছে না, হয়রানি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকারি অর্থ অপচয় হচ্ছে। এইভাবে সিএজি কার্যালয়ের নিরীক্ষা কাজের গুরুত্ব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করছে, সর্বোপরি সরকারের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

টিআইবির গবেষণার আলোকে সিএজি কার্যালয়ের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিচে উল্লেখিত কতিপয় সুপারিশ প্রদান করছে।

স্বল্প মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১.	সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মাধ্যমে আলোচনার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত নিরীক্ষা আইন, অর্গানোগ্রাম ও নিয়োগের বিধিমালার অনুমোদন দিতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
২.	সিএজিসহ এই কার্যালয়ের সকল নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করতে হবে	রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সিএজি কার্যালয়
৩.	ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সে সিএজিকে উচ্চ আদালতের বিচারপতির সম মর্যাদা দিতে হবে। ডিসিএজি সিনিয়র ও এডিজি (ফিন্যান্স) রেলওয়ে ও ডিজি ফিমাকে গ্রেড ১, মহা পরিচালকদের গ্রেড ২ করাসহ নিম্নের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে	মন্ত্রী পরিষদ ও অর্থ মন্ত্রণালয়
৪.	ওসিএজিকে বাজেট, নিয়োগসহ সকল বিষয়ে সাংবিধানিক স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়কে তা নিশ্চত করতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়
৫.	সিএজিকে তার অধীনস্থ বিশেষ করে কোয়ালিটি কন্ট্রোল টিমসহ সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৬.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ভাল পারফরমেন্সের জন্য পুরস্কার বা প্রণোদনার ব্যবস্থা করা ও দুর্নীতিসহ বিধি-বহির্ভূত কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৭.	সিএজি কার্যালয় থেকে নিরীক্ষার জন্য একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা করতে হবে যা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। নিয়মিতভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ে নিরীক্ষা কাজ সম্পাদনের জন্য ফলোআপ এবং সুপারভিশন জোরদার করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৮.	নিরীক্ষার প্রতিবেদন কত দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির নিকট জমা দিতে হবে ইত্যাদি বিষয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ ও কার্যকর করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
৯.	সিএজি কার্যালয়ের অভিযোগ সেল সম্পর্কে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জানানোর জন্য প্রচারণা চালানো এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১০.	বছরে একবার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও বিবরণ প্রকাশ করতে হবে এবং অবৈধ উৎস থেকে আয়কৃত অর্থের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১১.	নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দুর্নীতির তথ্য ব্রেকিং নিউজের ন্যায় সিএজির ওয়েবসাইটে স্ক্রলের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার দিনই প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিবেদনের তথ্য সম্পর্কে জনগণকে জানাতে হবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে	সিএজি কার্যালয়

মধ্যম মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১২.	বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও বড় আকারের দুর্নীতির তথ্যগুলো সিএজি পিএসিকে দিবে যাতে পিএসি এই দুর্নীতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য সুপারিশ করতে পারে	সিএজি কার্যালয়, পিএসি ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়
১৩.	সিএজির প্রয়োজনীয়তা যাচাই করে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো হাতে নিতে হবে এবং প্রকল্পগুলোর পরামর্শক নিয়োগের জন্য নিজস্ব নীতিমালা থাকতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৪.	ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০% করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা করার জন্য তাদের সমন্বয়ে নিরীক্ষা দল গঠন করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৫.	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরকে দুটি আলাদা অধিদপ্তরে ভাগ করতে হবে	সিএজি কার্যালয়
১৬.	জরুরি কার্যক্রমের (ক্রাস প্রোগ্রাম) মাধ্যমে দীর্ঘ দিনের পুরোনো নিরীক্ষা আপত্তিগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে হবে	পিএসি, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়
১৭.	সিজিএ কার্যালয়ের সাথে সিএজি কার্যালয়ের অনলাইন সংযোগ থাকতে হবে যাতে সিএজি নিরীক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতির অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও ব্যয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায়	সিএজি কার্যালয় ও সিজিএ কার্যালয়

১৮.	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সঠিক নীতিমালার তৈরি করে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তাদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করাতে হবে	অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সিএজি কার্যালয়

দীর্ঘ মেয়াদী সুপারিশ

ক্রম	সুপারিশ	সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ
১৯.	সরকারি প্রতিষ্ঠানের অর্থ ব্যয় ও হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রণালয়গুলোতে দক্ষ জনবলের সমন্বয়ে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ শাখা খুলতে হবে	অর্থ মন্ত্রণালয়
২০.	নিয়মানুবর্তী নিরীক্ষা থেকে পারফর্মেন্স নিরীক্ষার দিকে যাওয়ার জন্য একটি কৌশল তৈরি করতে হবে এবং এর জন্য ধীরে ধীরে জনবল ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে	সিএজি কার্যালয়

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

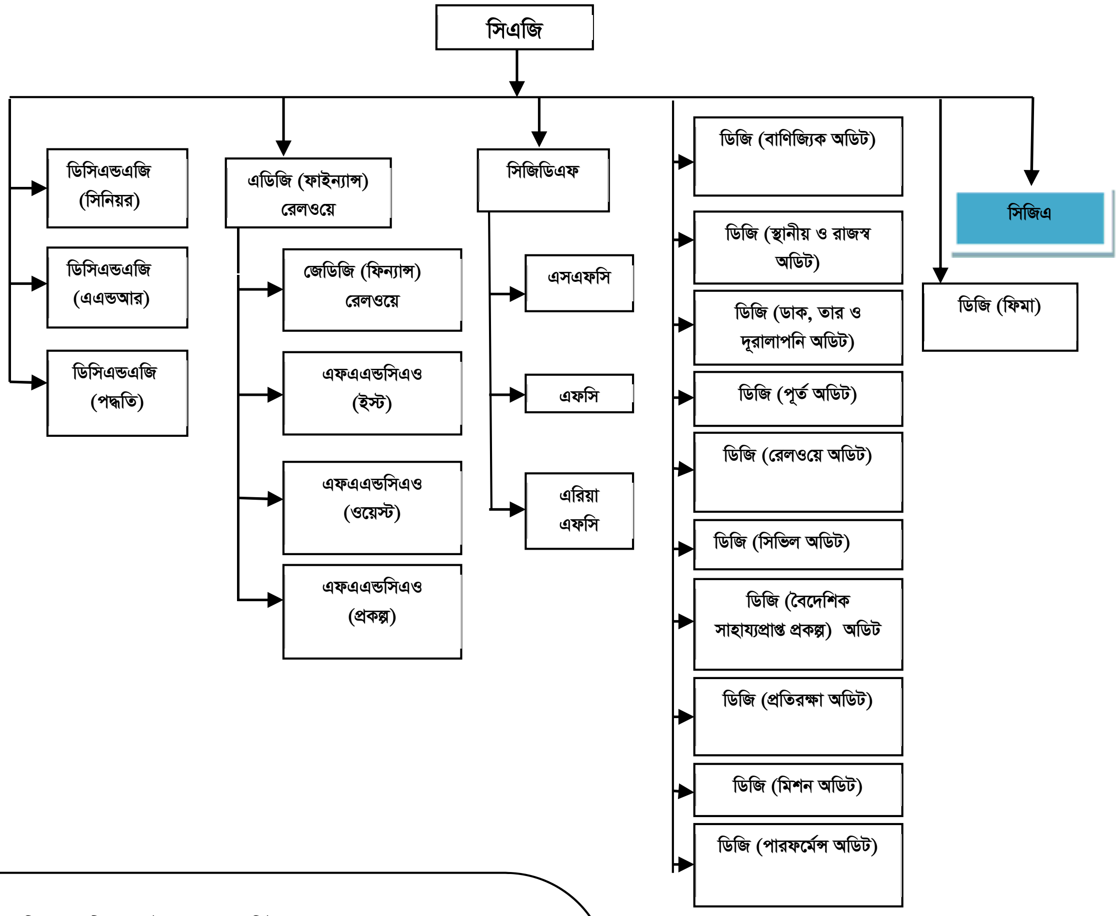

ডিসিএন্ডএজি- ডেপুটি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
সিজিএ- কম্পট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টএস
সিজিডিএফ- কম্পট্রোলার জেনারেল অব ডিফেন্স ফিন্যান্স
ডিজি- ডাইরেক্টর জেনারেল
সিএও- চী ফ একাউন্টস অফিসার
আরএও- রিজিওনাল একাউন্টস অফিসার
ডিএও- ডিসট্রিক্ট একাউন্টস অফিসার
টিএও- থানা একাউন্টস অফিসার
জিডিজি- জয়েন্ট ডিরেক্টর জেনারেল
এফএএন্ড সিএও- ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার এন্ড চীফ একাউন্টস অফিসার
এসএফসি- সিনিয়র ফিন্যান্স কন্ট্রোলার
এফসি- ফিন্যান্স কন্ট্রোলার
ফিমা- ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট একাডেমী

পরিশিষ্ট ২: অডিট অধিদপ্তরের কার্যক্রম এবং লোকবল

ক্রম	অধিদপ্তর	অধিক্ষেত্র	লোকবল
১	বাণিজ্যিক অডিট	• সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমুহ • রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ সহ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমুহ	মঞ্জুরীকৃত- ১০৫৩ কর্মরত- ৬৩১
২	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট	• রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্সিসমূহ এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগসমুহ • পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় সহ স্থানীয় ও বিধিবদ্ধ সংস্থাসমুহ	মঞ্জুরীকৃত- ৬০৫ কর্মরত- ৪৩১
৩	সিভিল অডিট	• কন্ট্রোলার জেনারাল অব একাউন্টস এর অধীন সকল কার্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত প্রজাতন্ত্রের হিসাব সংক্রান্ত নিরীক্ষা • সরকারের আর্থিক ও উপযোজন হিসেবের প্রত্যায়ন	মঞ্জুরীকৃত- ৩১৬ কর্মরত- ২২৭
৪	প্রতিরক্ষা অডিট	• সশস্ত্র বাহিনীর সকল ইউনিট ও ফরমেশন, আন্তঃবাহিনী সংগঠনসমূহ এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের কার্যালয়সমূহ • প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত উপযোজন হিসেবের প্রত্যয়ন	মঞ্জুরীকৃত- ১৯০ কর্মরত- ১৫০
৫	পূর্ত অডিট	• পূর্তকার্য এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন- উপযোগ সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমুহের ব্যয় সংক্রান্ত নিরীক্ষা	মঞ্জুরীকৃত- ৩৬২ কর্মরত- ২৬৩
৬	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিট	• সকল বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্পের হিসাব প্রত্যয়ন	মঞ্জুরীকৃত- ২৫০ কর্মরত- ২২৫
৭	মিশন অডিট	• বিদেশে অবস্থিত সকল বাংলাদেশ মিশন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, সমুদ্র পরিবহন সংস্থা এবং বিমান কার্যালয় সমুহ	মঞ্জুরীকৃত- ৫০ কর্মরত- ৩৫
৮	ডাক, তার ও দুরালাপনি অডিট	• ডাক, তার ও দুরালাপনি বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠান • এ সকল বিভাগের উপযোজন হিসেবের প্রত্যায়ন	মঞ্জুরীকৃত- ৩০০ কর্মরত- ১৯৭
৯	রেলওয়ে অডিট	• বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠান	মঞ্জুরীকৃত- ২১১ কর্মরত- ১৩৭
১০	পারফরমেন্স অডিট	• বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার আওতায় প্রতিষ্ঠানসমুহ	মঞ্জুরীকৃত- ৩১ কর্মরত - ২৪
	মোট		মঞ্জুরীকৃত- ৩৬৫২ কর্মরত- ২৩২০

উৎস: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১১

পরিশিষ্ট ৩: অধিদপ্তর, সিএজি কার্যালয় ও ফিমা অনুযায়ী ক্যাডার কর্মকর্তার সংখ্যা

ক্রম	অধিদপ্তর	কর্মরত ক্যাডার কর্মকর্তাদের সংখ্যা
১	সিএজি কার্যালয়	১৮
২	ফিমা	৪৪
৩	বাণিজ্যিক অডিট	১২
৪	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট	১১
৫	সিভিল অডিট	৬
৬	প্রতিরক্ষা অডিট	৫
৭	পূর্ত অডিট	৬
৮	বৈদেশিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রকল্প অডিট	১০
৯	মিশন অডিট	৩
১০	ডাক, তার ও দুরালাপনি অডিট	৫
১১	রেলওয়ে অডিট	৫
১২	পারফরমেন্স অডিট	৪
মোট		**১২৯**

তথ্যসূত্র

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
২. Annual Report, 2012. Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৩. Annual Report, 2011. Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৪. CAG News, 2012. Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৫. Civil audit directorate, 2000. *Audit Manual.* Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৬. Hakim, A. A., 2013. *Public Financial Management: The role of supreme audit institution (SAI) of Bangladesh- Issues & Challenge.* Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৭. *Institutions of Accountability Series,* 2009. (Background Paper) Dhaka: Institute of Governance Studies BRAC University.
৮. Manual of Standing Orders (MSO), 2007. Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
৯. মিয়া, মো. ডফ., ২০০৯. *ট্রেজারী রুলস্।* তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা: রোদ্দুর প্রকাশনী
১০. মিয়া, মো. ডফ., ২০১১. *জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্।* চতুর্থ সংস্করণ। ঢাকা: রোদ্দুর প্রকাশনী
১১. অডিট কোড, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
১২. গভর্নমেন্ট অডিটিং স্টান্ডার্ড, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
১৩. চক্রবর্তী রণজিৎ কুমার, ট্রেজারি রুলস এবং উহার অধীনে প্রণীত সাবসিডিয়ারী রুলস্ (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯
১৪. চক্রবর্তী রণজিৎ কুমার, জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (বঙ্গানুবাদ), মে ১৯৯৯
১৫. Strategic plan 2013- 2018. Dhaka: The comptroller and auditor general of Bangladesh.
১৬. সরকারী নিরীক্ষকদের জন্য ন্যায়- নীতি বিধিমালা, ২০১০। ঢাকা: কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
১৭. Reduction of Audit review backlog by Public Accounts Committee, 9th Parliament of Bangladesh, June 27, 2012
১৮. http://www.oecd.org/development/effectiveness/41085468.pdf
১৯. Public Sector Accounting and Auditing, World Bank report
২০. সিভিল অডিট ম্যানুয়াল, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
২১. স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট ম্যানুয়াল, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
২২. ইনফরমেশন টেশনলজি পলিসিজ, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
২৩. মিডিয়া হ্যান্ডবুক, কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল অফ বাংলাদেশ
২৪. দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট ১৯৭৪
২৫. Warrant of Precedence, 1986 (Revised upto 7 January 2008), Cabinet Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh.
২৬. Rules of Business, 1996 (Revised up tp July 2012), Cabinet Division, Government of the Peoples Republic of Bangladesh
২৭. আমিনুজ্জামান, এম সালাউদ্দীন এবং খায়ের সুমাইয়া, জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ, মে ২০১৪
২৮. http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/16043/Granskningsplan, ২৯ আগস্ট ২০১৪
২৯. অ্যাক্ট অন অডিট অফ স্টেট এশটিভিটিস ইটিসি. (২০০২:১০২২), http://www.riksrevisionen.se/en/Start/About-us/, ৩১ আগস্ট ২০১৪
৩০. http://cag.gov.in/html/unionaudit.htm, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৩১. http://www.humanrightsinitiative.org/publications/const/effectiveness_of_the_public_audit_system_in_india.pdf, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩২. www.anao.gov.au, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৩. http://www.gao.gov/legal/redbook/redbook.html, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৪. www.saiindia.gov.in, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৫. http://intosaiitaudit.org/mandates/writeups/uk.htm, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৬. http://www.tbs-sct.gc.ca/ocg-bcg/index-eng.asp, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৭. http://www.tbs-sct.gc.ca/ocg-bcg/abu-ans/structure-eng.asp, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৮. www.auditorgeneral.gov.lk/web, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩৯. http://www.tutorgigpedia.com/Comptroller+and+Auditor+General_es.html, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৪০. http://www.audit.vic.gov.au/about_us/the_audit_process.aspx, ১৮ মার্চ ২০১৩
৪১. http://www.asosai.org/R_P_financial_accountability/chapter_4_india.htm, ২০ মার্চ ২০১৪
৪২. http://latur.nic.in/html/elibrary-new, The comptroller and Auditor-General's (Duties, Power and Conditions of Service) Act, 1971 Act no.56 of 1971 [15th December, 1971. ৭ জুলাই ২০১৪
৪৩. Hakim, Ahmed Ataul, Bangladesh Perspective of Public Sector Accounting & Auditing: Status review, Issues & Reforms, ICAB-CAPA International Conference 2012
৪৪. The Paris Declaration on Aid Effectiveness and the Accra Agenda for Action, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf, 13.01.14
৪৫. The Role of Supreme Audit Institutions in Combating Corruption, Transparency International

-০-